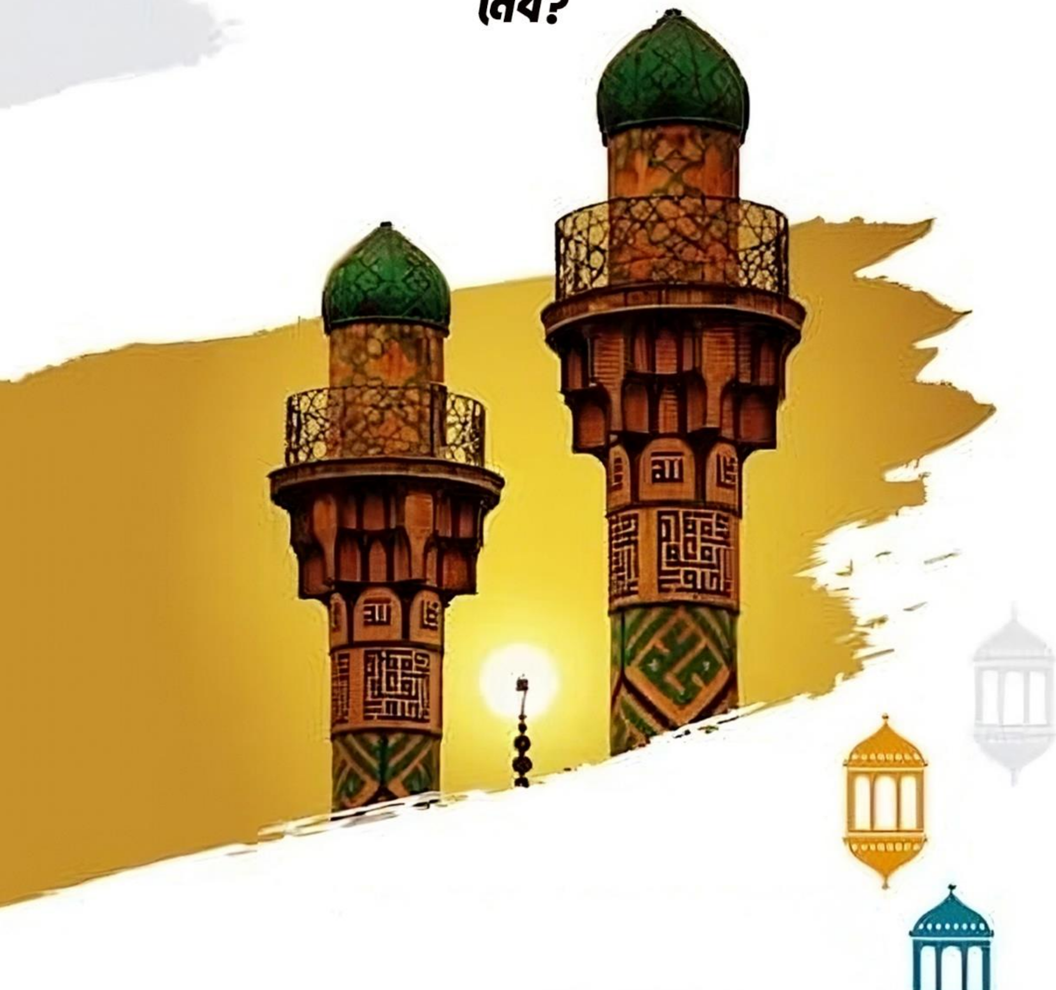
কীভাবে
মাহে রমযানের প্রস্তুতি
নেব?



মাওলানা আবু মিকদাদ হাফিযাহুল্লাহ

কীভাবে মাহে রমযানের প্রস্তুতি নেব?

রচনা

মাওলানা আবু মিকদাদ হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة

উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

কীভাবে মাহে রমযানের প্রস্তুতি নেব?

রচনা

মাওলানা আবু মিকদাদ হাফিযাহুল্লাহ

- প্রথম প্রকাশ
  রমজানুল মোবারক ১৪৪৬ হিজরী
  মার্চ ২০২৫ ইংরেজি

- প্রকাশক
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

সূচীপত্র

তাকওয়া ও আত্মসমর্পণ.. ৮

তাকওয়ার পরিচয়.. ৯

আত্মসমর্পণ ও তাকওয়ার মধ্যকার সম্পর্ক.................................. ১৩

আত্মসমর্পণের এক অনুপম দৃষ্টান্ত..১৪

তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ১৬

রমযান ও তাকওয়া.. ১৮

জিহাদঃ আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম.................................. ২০

তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন ২৬

তাকওয়া সংক্রান্ত তিনটি আয়াত ও তা হতে প্রাপ্ত গুণাবলি.....................২৭

রমযানের আগেই রমযানের প্রস্তুতি নিবো কেন? ৩২

১। তাওবার মাধ্যমে রমযানের পূর্বেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা............. ৩৪

সিয়াম: ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্ক গড়ার অন্যতম উপায়...................... ৩৫

ক্ষমার গতির এক অনন্য উদাহরণ ৪১

মাগফিরাত ও রহমত যেন সহোদরা বোন.....................................৪৫

ক্ষমা ও রহমত বান্দার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি.....................................৪৭

আপনার নামায সুন্দর থেকে সুন্দরতর করুন ৪৯

০২. এখন থেকেই নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করা.............................. ৫০

একটি চমৎকার মূলনীতি..৫১

নামাযের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো দৃঢ়তার সাথে অনুশীলন করতে পারি..........৫১

অযুতে পানি অপচয় না হয়.. ৫৩

জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করুন..৫৭

মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করুন ৫৭
নামাযের আগে ও পরে ফারেগ থাকুন ৫৮
যারা ওজরের কারণে মসজিদে যেতে পারেন না.................................. ৬৫
আসবাব ও মাকসাদ বিষয়ে কিছু কথা.. ৬৬
কয়েকটি শিক্ষা...৭৪
লাগাতার চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায়ের অনুশীলন করুন ৭৫
০৩. অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা................................. ৭৮
আমরা কুরআনকে আপন করতে চাই এটি কীভাবে প্রকাশ পাবে? ৭৯
পূর্ণ কুরআনের সুপারিশ..৮০
কুরআনের সূরাগুলোও সুপারিশ করবে... ৮১
সাহাবায়ে কেরামের ‘ইলমে কুরআন’ এত গভীর কেন? ৮৩
তাকওয়ার স্তরভেদে কুরআনের ইলম উদ্ভাসিত হয়............................ ৮৪
কুরআন অমূল্য কষ্টিপাথর ৮৫
০৪. এ মাসে (শাবানে) বেশি বেশি সিয়াম পালন করা........................ ৮৭
রমযানের আগে-পরের রোযাগুলোর গুরুত্ব......................................৮৮
০৫. বেশি বেশি দোয়া করা ও তাওফীক কামনা করা.......................... ৯০
০৬. ইহতিসাব। আল্লাহর কাছে আজর পাওয়ার আশা অন্তরে তৈরি করা.... ৯৩
নিজ অনিষ্ট থেকে সবাইকে রক্ষা করুন এবং ক্রোধ দমন করুন ৯৭
০৭. নিজের সকল মন্দ আচরণ থেকে অপর মুসলিমকে হেফাযতে রাখার সংকল্প করা ৯৮
রোযায় দেহের পাশাপাশি দিলেরও পরিবর্তন হতে হবে..........................৯৯
“আমি রোযাদার”- এ কথাটির চর্চা বৃদ্ধি করব................................ ১০০

রোযার হেফাযত করুন...১০১
সবচেয়ে সহজ রোযা...১০২
সবচেয়ে কঠিন রোযা...১০২
০৮. গোস্বা সংবরণ, অপরকে ক্ষমা করা এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলার অনুশীলন...১০২
গোস্বা সংবরণের অনুশীলন ঘর থেকে শুরু করব.............................১০৩
দ্বীনদারি সবার শেষে ঘরে আসে...১০৪
‘গোস্বা সংবরণ’ রোযার পূর্ণতার অন্যতম উপাদান.............................১০৬
গোস্বা বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ...১০৯
গোস্বা সংক্রান্ত একটি হাদীস...১১১
গোস্বার ব্যাপার সালাফদের কিছু উক্তি...১১৪
মানুষের জাহালাতপূর্ণ আচরণকে এড়িয়ে চলব...১১৬
হিলম ও হুলম...১২০
বিক্ষিপ্ত দুটি কথা...১২২

তাকওয়া ও আত্মসমর্পণ

১ম মজলিস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হও।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

শাবান মাস চলছে। পবিত্র মাহে রমযান আমাদের মাথার উপর ছায়া ফেলছে আলহামদুলিল্লাহ। রমযান আগমনের মূল উদ্দেশ্য কী, তা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাহে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন এবং রমযানের ভরপুর রহমত ও মাগফিরাত প্রাপ্তির মাধ্যমে মুত্তাকীনদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। শাবান মাসে রমযানের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে আমরা কী কী করতে পারি, তা নিয়ে আমরা এ মজলিসে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। মোট আটটি শিরোনামের উপর আলোচনা হবে। প্রথম দিকের আলোচনাগুলোকে মূল আলোচনার ভূমিকা।

শিরোনামগুলো হলো,

১। তাওবার মাধ্যমে রমযানের পূর্বেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন।
২। এখন থেকেই নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করুন।
৩। রমযানের পূর্বেই কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।
৪। শাবানে বেশি বেশি সিয়াম পালন করুন।
৫। বেশি বেশি দোয়া করুন এবং তাওফীক কামনা করুন।
৬। ইহতিসাব; আল্লাহর কাছে আজর প্রাপ্তির আশা মনে জাগ্রত করুন।
৭। নিজের সকল মন্দ আচরণ থেকে অপর মুসলিমকে হেফাযতে রাখার সংকল্প করুন।
৮। গোস্বা সংবরণ, অপরকে ক্ষমা করা এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলার অনুশীলন শুরু করুন।

মূল আলোচনা শুরু করার আগে ভূমিকা হিসেবে কিছু কথা আরজ করছি।

ভূমিকা

তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ হলো- রক্ষা করা। হেফাযত করা। বাঁচানো। অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা।

বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা যেহেতু আমাদের এ মজলিসগুলোর উদ্দেশ্য নয়, তাই মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি।

তাকওয়ার পরিচয় জানার আগে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রথমে দেখে নিই-

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَة رَهْط إِلَى بيُوت أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أخبروا كَأَنَّهُمْ تقالوها فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أحدهم أما أَنا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْل أبدا وَقَالَ آخر أَنا أَصوم الدَّهْر وَلَا أفطر وَقَالَ آخر أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مني». —صحيح البخاري (**5063**) صحيح مسلم (**1401**)

অর্থ: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তিন ব্যক্তির একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরের নিকট আসলো। যখন তাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো, যেন তাঁদের কাছে তা কম মনে হলো, আর বললো, "আমরা কোথায় আর নবীজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোথায়? তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" তখন একজন বললো, "আমি সব সময় রাতভর নামায পড়তে থাকবো।" অপর একজন বললো, "আমি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখতে থাকবো, রোযা ভাঙ্গবো না।" অপর একজন বললো, "আমি নারীদের থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন এবং বললেন, "তোমরাই এসব এসব কথা বলেছ? সাবধান! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের

চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। অথচ আমি রোযা রাখি এবং ভাঙ্গি। (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই এবং বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" [সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী।
সুতরাং হাদীস থেকে বুঝা গেল, অধিক ইবাদতের নাম তাকওয়া নয়, নিজের আবেগ মতো ইবাদত করার নাম তাকওয়া নয়। বরং আল্লাহর মানশা ও সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল করার নাম তাকওয়া। আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে নিজেকে ন্যস্ত করার নাম তাকওয়া। আল্লাহর মানশা ও মর্জির সামনে আত্মসমর্পণ করার নাম তাকওয়া।
বান্দা আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে নিজেকে কতটুকু ন্যস্ত করে, আল্লাহ মূলত এটাই দেখতে চান।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রথম থেকেই বাইতুল্লাহ কিবলা ছিল। মাঝে ১৬/১৭ মাসের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানানো হয়। এরপর চিরকালের জন্য বাইতুল্লাহকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে ১৬/১৭ মাসের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর পিছনে গূঢ় রহস্য কী? তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. —البقرة: 143

অর্থ: "(১৬/১৭ মাসের জন্য) তুমি যে কিবলার উপর ছিলে, তাকে আমি কিবলা বানিয়েছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, আমি দেখতে চাই, কে রাসূলকে অনুসরণ করে? আর কে তার পিছন দিকে ফিরে যায়। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত কঠিন, তবে তাদের জন্য (কঠিন) নয়, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন...।" [সূরা বাকারা ০২: ১৪৩]

এই অল্প সময়ের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর পিছনে আল্লাহর ইলমে অনেক অনেক হিকমত থেকে থাকবে। তবে সবচেয়ে মুখ্য হিকমত-রহস্য হলো, আল্লাহ দেখতে চান, কে আবেগের পিছনে ছুটে, আর কে আল্লাহর হুকুমের পিছনে ছুটে? যেহেতু বনি ইসমাঈলের আবাসভূমি ছিল পবিত্র মক্কা, তাই বাইতুল্লাহ তাদের আবেগের জায়গায় বহুকাল থেকেই অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে আছে। তাই ১৬/১৭ মাসের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে আল্লাহ দেখতে চাইলেন, তারা আবেগ থেকে সরে এসে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে পারছে কিনা?

অনেক সময়ই আমরা আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদের আবেগ ও যুক্তিকে জায়গা দিয়ে ফেলি। মূলত এসব আবেগ আর যুক্তিকে দূর করাই এই কিবলা পরিবর্তনের বড় ও মূল মাকসাদ।

নিজের আবেগ ও যুক্তিকে দূরে ঠেলে দিয়ে যারা আত্মসমর্পণ করতে পারে তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত আয়াতে হেদায়াতপ্রাপ্ত

বলেছেন। আর যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তারাই তাকওয়ার অধিকারী হয়। তাই তো সূরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীনদের গুণগুলো উল্লেখ করার পর বলছেন-

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)

"এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এরাই সফলকাম।" [সূরা বাকারা, ০২:০৫]

সুতরাং আমরা একটি উপসংহারে আসতে পারি-

তাকওয়া হলো, আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করার নাম। আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে বিনা সংকোচে মেনে নেয়ার নাম।

আত্মসমর্পণ ও তাকওয়ার মধ্যকার সম্পর্ক

আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করাকে আরবীতে 'ইসলাম' বলে। আর যারা আত্মসমর্পণ করতে পারে, তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, **فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا** "যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হেদায়াত পেয়ে গেল....." [সূরা আলে-ইমরান, ০৩:২০]

উপরে আমরা দেখেছি, যাদের মাঝে তাকওয়ার গুণাবলি আছে তাদেরকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। একইভাবে এখানেও বলা হচ্ছে, যাদের মাঝে ইসলাম রয়েছে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং বুঝা গেল, তাকওয়া ও আত্মসমর্পণ একসূত্রে গাঁথা।

তবে উভয়ের মাঝে অল্প পার্থক্য এটা করা যায়,

ইসলাম হলো, শরীয়তের বিধানের সামনে আত্মসমর্পণের বাহ্যিক হালাত। আর তাকওয়া হলো, আত্মসমর্পণের আত্মিক হালাত। এ কারণেই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেছেন, التقوى ههنا (তাকওয়া এখানে)

আত্মসমর্পণের এক অনুপম দৃষ্টান্ত

'আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম' এ কথাটি নিচের হাদীসে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে-

মক্কা বিজয়ের পর পর হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফের যুদ্ধ হয়। তায়েফের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মূল ফটক বন্ধ করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, দুর্গের ভেতর থেকে যে কোনো গোলাম বের হয়ে ইসলাম কবুল করবে, তাকে আযাদ করে দেয়া হবে। তখন ২৩ জন গোলাম বের হয়ে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে একজনের ঘটনা হাদীসের কিতাবগুলোতে এসেছে-

عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ: أَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ كَيْ أَعْمَلَهُ؟ فَقَالَ: «تُقَاتِلُ قَوْمًا جِئْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ» فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَجُزِيَ كَثِيرًا» (مسند أبي داود الطيالسي)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের সাথে লড়াই করছিলেন। তখন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক ব্যক্তি আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ইসলাম পেশ

করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং বললো, (এখন) সর্বোত্তম আমল কোনটি; যাতে আমি করতে পারি...? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাদের থেকে এসেছ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তখন সে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে অল্প আমল করলো; কিন্তু বিরাট প্রতিদান পেল।" [মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালিসী, হাদীস নং ৭৬০] হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও এসেছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, ওই ব্যক্তি যিনি জিহাদে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন, বাহ্যত তার আমলনামায় কোনো নামায নেই, রোযা নেই। কিন্তু যেটি আছে তা হলো, আল্লাহর যখন যে হুকুম, সে হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করা। এর নামই ইসলাম।

নিচের আয়াতে তাকওয়া ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্ট-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} –آل عمران: 102

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর। এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" -সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১০২

আয়াত থেকে বুঝা যায়, যথাযথ তাকওয়া হলো, আল্লাহর বিধানের সামনে মনেপ্রাণে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ এ কথা দিলে চলে আসা যে, আল্লাহর যেকোনো বিধান আমার সামনে আসবে, আমি তা আদায়ের জন্য শতভাগ প্রস্তুত।

অন্তরের এ হালাত নিয়ে মৃতুবরণ করতে পারলেই বুঝা যাবে আমি যথাযথ তাকওয়ার উপর মৃত্যুবরণ করতে পেরেছি।

তাকওয়ার বিষয়টি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে শায়খ আবু ইমরান হাফিযাহুল্লাহর একটি আলোচনা খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। শায়খ তাকওয়ার তিনটি স্তর বলেছেন। তাকওয়ার উপর আরব মাশায়েখদের অনেক আর্টিকেল পড়েছি, কিন্তু এত সুন্দর করে গোছানো আলোচনা আর কোথাও পাইনি। আল্লাহ শায়খকে উত্তম জাযা ও দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন।

তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর

তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ হলো- বাঁচানো, রক্ষা করা, হেফাযত করা। এ অর্থটি মাথায় থাকলে স্তরগুলোতে তাকওয়ার অর্থ কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা স্পষ্ট হবে।

প্রথম স্তর: ঈমান আনার মাধ্যমে তাকওয়া। কেউ যখন ঈমান আনে, এর বদৌলতে সে তাকওয়ার ন্যূনতম পর্যায়টি অর্জন করে। এর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে চির জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচায়। এর নিচে তাকওয়ার কোনো স্তর নেই।

দ্বিতীয় স্তর: এর চেয়ে উপরের স্তর হলো, বান্দা তার উপর অর্পিত যত ফরয আছে সব আদায় করে এবং সকল হারাম থেকে বিরত

থাকে। কারো মাঝে যদি এ পর্যায়ের তাকওয়া অর্জন হয়ে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, সে জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তাকে এক মুহূর্তের জন্যও জাহান্নামে যেতে হবে না ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় স্তর: এর চেয়েও উপরের স্তর হলো, (ঈমান আনা, ফরয ইবাদত পালন ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি) এমন মুবাহ কাজ থেকেও বিরত থাকা, যেগুলো আখিরাতের যাত্রাপথে তার জন্য নিষ্প্রয়োজন।

এ স্তরটি অনেক বিস্তৃত। এ স্তরে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী জান্নাতে নিজের পর্যায় উন্নীত করে। وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوْا (প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যার যার আমল অনুযায়ী বহু বহু স্তর।) এ স্তরে ব্যক্তি তার তাকওয়া ও আনুগত্যের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে শুধু নিজেকে বাঁচায়ই না, বরং জান্নাতে তার মর্যাদা অনেক অনেক উঁচু করতে সমর্থ হয়।

এ স্তরটি এমন একটি স্তর, যেখানে বান্দা নিজেকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখতে পারে। এমন ব্যক্তিরা আল্লাহর আনুগত্যের বড় বড় নিদর্শন স্থাপন করতে পারে।

এমন ব্যক্তি আখিরাতের যাত্রা পথে নিষ্প্রয়োজন মুবাহ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে। ফারায়েয ও ওয়াজিবাত আদায়ের পাশাপাশি

আখিরাতের যাত্রা পথে সহায়ক নফল ইবাদতে প্রচুর পরিমাণে নিজেকে আটকে রাখতে সমর্থ হয়।

এমন ব্যক্তিকে আপনি দেখবেন, কুরআনের সাথে তার সম্পর্ক গভীর। গভীর রাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর তাওফীক পাচ্ছে। খুঁজে খুঁজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহগুলো পালন করছে। গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করছে।

এমন ব্যক্তিকে দেখবেন, নামাযে দাঁড়িয়েছে তো কোনো নড়াচড়া নেই। একেবারে স্থির হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মশা-মাছি তাড়ানো, ধুলাবালি সরানো, কাপড়ের ভাঁজ সোজা করা এগুলোর দিকে তার বিন্দুমাত্র নজর নেই। সে আল্লাহর সামনে ছোটখাট বিষয়গুলোকে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতে পারে।
আল্লাহর সামনে তার আনুগত্য অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন হবে।

রমযান ও তাকওয়া

মূলত এই তৃতীয় স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানের দৌলত নসীব করেছেন।
একটু লক্ষ করুন:
রমযানে রোযার মধ্যে আমাদের প্রশিক্ষণটা কী ধরনের হয়?

এ মাসে মুবাহ-বৈধ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। রোযার মধ্যে তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। আহার করা, পান করা, স্ত্রী সহবাস করা। এগুলোর যেকোনো একটি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। অথচ দেখুন, এগুলো স্বাভাবিক সময়ে মুবাহ-বৈধ ছিল। কিন্তু রমযানে ৩০টি রোযার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর হুকুমের সামনে এমনভাবে আনুগত্য দেখাতে হয় যে, এই বৈধ জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকতে হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বান্দা নিজের উপর সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। ফলে তার জন্য আল্লাহর চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা সহজ হয়ে যায়।

এ মাসে স্বাভাবিক মুবাহ কাজগুলো থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্যতার এমন স্তরে নিয়ে যেতে চান, যেন যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো স্থানে আমরা নির্দ্বিধায় আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

বিষয়টি এমন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পেলে একটি স্বাভাবিক বৈধ জিনিসও ছেড়ে দিতে পারে, তার জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে অন্যায়-অপরাধ ছেড়ে দেওয়া বা কোনো বিধানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া তো মামুলি বিষয়। রমযানের মাধ্যমে আল্লাহ মূলত তাঁর বান্দাকে এমন বানাতে চান।

লক্ষ করুন, এখন কেউ যদি রমযানে তাকওয়ার তৃতীয় স্তরের প্রশিক্ষণ নিতে এসে তাকওয়ার দ্বিতীয় স্তরকেই ভাঙ্গতে থাকে, যেমন-মিথ্যা বলতে থাকে, গীবত করতে থাকে, ঝগড়া করতে থাকে, নামায ছাড়তে থাকে, হারামে লিপ্ত হতে থাকে এবং ফরয-ওয়াজিব ছাড়তে

থাকে; তাহলে এমন ব্যক্তি তাকওয়ার তৃতীয় স্তরের প্রশিক্ষণ নিয়ে কী করবে?

এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে-

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». -صحيح البخاري: **1903**

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং এর উপর আমল ছাড়তে পারলো না, এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রতি আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।" -সহীহ বুখারী: **১৯০৩**

অপর এক হাদীসে এসেছে-

«رُبَّ قَائِمٍ حَظّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ وَالعَطَشُ» -رواه ابن ماجه: 1690 وابن خزيمة: 1997 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 69) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

অনেক তাহাজ্জুদ গুজার এমন রয়েছে, যার ভাগে রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই নেই। আবার অনেক রোযাদার এমন রয়েছে, যার ভাগে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই নেই।" -সুনানে ইবনে মাজাহ: **১৬৯০**; সহীহ ইবনে খুযাইমা: **১৯৯৭**

আশা করি সকলের কাছেই উপরের আলোচনাটুকু বোধগম্য হয়েছে।

জিহাদঃ আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম

এবার আমরা এমন একটি হাদীস নিয়ে আলোচনা করবো, যা প্রতিটি মুজাহিদের জন্য উত্তমভাবে উপলব্ধি করা জরুরি-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ "- مسند أحمد: 22051 وروى الترمذي نحوه: 2616 وقال: هذا حديث حسن صحيح

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।" -[মুসনাদে আহমদ: ২২০৫১; জামে তিরমিযী: ২৬১৬]

এ হাদীসের মর্ম জিহাদপ্রেমী প্রতিটি ভাই বুঝা উচিত। হাদীসটি বুঝলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো, আমরা কোন পথে পা দিয়ে কী কী স্বপ্ন দেখছি; অথচ আমাদের হালাতের সাথে আমাদের স্বপ্নের পার্থক্য কত বেশি!

'ইসলাম' শব্দের মূল অর্থ আমরা আগেই জেনেছি- "আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা।"

সুতরাং মূল অর্থের দিকে তাকিয়ে হাদীসের অর্থ করলে অর্থ " ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ "হয়-

"আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।"

বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক-

মানুষের কাছে তার জীবনের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। তাই এই মূল্যবান জিনিসটি কেউ আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত না

হলে উৎসর্গ করতে পারে না। সত্যি বলতে শাহাদাত মামুলি কোনো বিষয় নয়।

সুতরাং জিহাদকে আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার অর্থ হলো, কেউ যখন আল্লাহর সকল বিধানকে পালন করতে করতে উপরের দিকে চড়তে থাকে, তখনই সে প্রকৃত অর্থে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মতো আমল করতে পারে।

সুতরাং আমরা যারা আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে আছি যে, অন্যান্য বিধান যেমনই পালন করি, আমি জিহাদের মাধ্যমে সব ঘাটতি পূরণ করে ফেলবো, তাদের এ ধারণা ভুল।
বাস্তবেও দেখা যাবে, যারা জিহাদের আমল করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ আমলে অবিচল থেকেছেন, তাদেরকে আল্লাহর অন্যান্য বিধানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পন করে এই পর্যায়ে পৌঁছতে হয়েছে। অন্যথায় নিজের অন্যান্য আমল দুরস্ত করা না হলে, খুব সম্ভাবনা আছে পিছলে যাওয়ার।

যখন কেউ কোনো পাহাড়ে চড়ে, সে যখন একদম চূড়ায় পৌঁছতে চেষ্টা করে, তাকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের নিচ থেকে একটু একটু করে উপরের দিকে উঠতে হয়। কেউ যদি চিন্তা করে, আমি লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ে চড়ে যাবো, তাহলে দেখা যাবে সে উপরে পৌঁছার আগেই পিছলে যাবে।

তাই আমাদেরকে ইসলামের চূড়া তথা জিহাদের আমলে পৌঁছতে হলে, ইসলামের প্রতিটি স্তর বা আনুগত্যের প্রতিটি স্তর ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হবে। কিছু বাদ দিয়ে দিয়ে আমরা চূড়ায় পৌঁছতে পারবো না, বরং পা ফসকে একদম নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ হেফাযত করুন।

কুরআনের এ আয়াতটি দেখুন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ... –آل عمران: 155

অর্থ: "নিশ্চয় যারা উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্খলন ঘটিয়েছিল....।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৫৫]

ওহুদের যুদ্ধে যেসব সাহাবীর প্রথম পর্যায়ে পা পিছলে গিয়েছিল, তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই পদস্খলনের কারণ মূলত ইতিপূর্বে তাদের অসমীচীন কৃতকর্ম ছিল।

সুতরাং বুঝা গেল, জিহাদ সহজ কোনো আমল নয়। বরং এমন একটি আমল যেখানে আল্লাহর বিধানের সামনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করতে হয়। নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে হয়। তাই এই স্তরে উঠা সহজ কাজ নয়। বরং যারা পুরো পাহাড় ধীরে ধীরে অতিক্রম করেছে, তাদের জন্যই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করা সহজ।

আল্লাহর প্রতিটি বিধানের সামনে সঠিকভাবে আত্মসমর্পণ না করে চূড়ায় আরোহণ করতে চাওয়া মানে মাঝে ফাঁকা রেখে রেখে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করা। এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পদস্খলন হবেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

একটু লক্ষ করুন, ইসলামের দুটি বিজয় ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়; হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী বিজয়। বদর ও ফাতহে মক্কা।
মূলত সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে নিয়ে এ দুটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আল্লাহর সামনে নিজেদের সবচেয়ে বড় আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। রমযান মূলত আল্লাহ এ উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুটি যুদ্ধে আল্লাহর সামনে শ্রেষ্ঠ আনুগত্য পেশ করলেন। রমযান যেমনিভাবে কুরআনের মাস, একইভাবে জিহাদেরও মাস।
এই আনুগত্য কী পর্যায়ের কাম্য তা অনুধাবন করতে এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট-
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ – وهو موضع بين مكة والمدينة– فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ– رواه مسلم (1114)
অর্থ: হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে রমযান

মাসে রোযা রাখা অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে আসলেন, রাসূলকে বলা হলো, লোকদের জন্য রোযা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। সবাই আপনি কী করেন সে অপেক্ষায় আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর একটি পানি ভর্তি পাত্র আনতে বললেন। অতঃপর পাত্রটি উঁচু করে ধরে পানি পান করলেন, যাতে সবাই দেখে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো, কেউ কেউ (কষ্ট করেই) রোযা রেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারাই হলো অবাধ্য। তারাই হলো অবাধ্য।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৪]

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ। আনুগত্য কীসের নাম!

আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ কীসের নাম, তা এ হাদীসে অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বিপরীত হওয়ায় স্বয়ং রমযান মাসে রোযা রেখেও অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে।

এখানে মূল বিষয় এটাই, আবেগের নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তাঁদের হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম।

হাদীস থেকে বুঝা যায়, জিহাদ আবেগ দিয়ে হয় না, বরং আনুগত্য দিয়ে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

সুতরাং আমরা যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সাথে ধরে রাখতে চাই, যারা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থেকে আল্লাহর সামনে নিজের জীবনের নজরানা পেশ করতে চাই, তাদের জন্য রমযানে তাকওয়ার অনুশীলন অনেক বড় নেয়ামত। মূলত রমযানই নিজেকে গঠন করার এবং নিয়ন্ত্রিত করার সবচেয়ে উত্তম সুযোগ। এ সুযোগটি আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং এর জন্য অগ্রিম কী কী প্রস্তুতি নিতে পারি, তা নিয়েই এ মজলিসগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

***

তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন

২য় মজলিস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

রমযানে রোযা রাখার মাধ্যমে তাকওয়ার অনুশীলন হয়। তবে অনুশীলন করার মানেই মুত্তাকী হয়ে যাওয়া নয়। যেমন ইফতা পড়া মানেই মুফতী হয়ে যাওয়া নয়। ডাক্তারি পড়া মানেই ডাক্তার হয়ে যাওয়া নয়। বরং যার মধ্যে একটা স্থিতিশীল স্থির যোগ্যতা তৈরি হয়, সেই মুফতী হয়, ডাক্তার হয়। অনুরূপ তাকওয়ার বিষয়টিও। আপনি এক দুদিন কষ্ট করে ফেললেই তাকওয়া অর্জিত হয়ে যাবে না। বরং তাকওয়ার সিফাতগুলোকে নিজের ভেতরে স্থির করে ফেলতে হবে।

তাকওয়া সংক্রান্ত তিনটি আয়াত ও তা হতে প্রাপ্ত গুণাবলি

পবিত্র কুরআনে তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে মুত্তাকীদের অনেকগুলো সিফাত একত্রে আলোচিত হয়েছে-

প্রথম স্থানটি হলো, সূরা বাকারার শুরুর কয়েকটি আয়াত-

الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)

অর্থ: "আলিফ লাম মীম। এটি এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। (মুত্তাকী তারা) যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখে এবং তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তাঁরা অপন

রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরাই সফলকাম।” [সূরা বাকারা, ০২:০১-০৫]

আয়াতগুলোতে প্রাপ্ত গুণগুলো হলো-

- ايمان بالغيب (অদৃশ্যের প্রতি ঈমান)
- إقامة الصلاة (সালাত কায়েম করা)
- إنفاق من رزق الله تعالى (নিজের যা আছে তা থেকেই দান করা)
- إيمان بالقرآن (কুরআনের প্রতি ঈমান)
- إيمان بالكتب السابقة (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান)
- اليقين بالآخرة (আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস)

ঈমান ও ইয়াকীন উভয়টির অর্থই ‘বিশ্বাস’। তবে ইয়াকীন হলো ‘দৃঢ় বিশ্বাস’। এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব সময় মাথায় কাজ করে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন হচ্ছে এটাই। সুতরাং মুত্তাকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, আখিরাতকে সবসময় মাথায় রাখা।

দ্বিতীয় স্থান সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াত:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

অর্থ: পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে। বরং পুণ্য হলো, কোনো ব্যক্তি সে ঈমান রাখলো আল্লাহর প্রতি, শেষদিন ও ফেরেশতাদের প্রতি এবং আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং সওয়ালকারীদেরকে এবং দাস মুক্তিতে। আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে। আর যারা সংকটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা যারা জীবনকে সত্য করে দেখিয়েছে এবং এরাই মুত্তাকী। [সূরা বাকারা, ০২:১৭৭]

এ আয়াতে প্রাপ্ত গুণগুলো হলো-

- إيمان بالله (আল্লাহর প্রতি ঈমান)
- إيمان باليوم الآخر (আখিরাতের প্রতি ঈমান)
- إيمان بالملائكة (ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান)
- إيمان بالكتب (আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান)
- الإيمان بالنبيين (সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান)
- إيتاء المال على حبه أي حب الله أو حب المال

আল্লাহর ভালোবাসায় সম্পদ দান করা কিংবা সম্পদের)
(ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও দান করা

- إقامة الصلاة (সালাত কায়েম করা)
- إيتاء الزكاة (যাকাত প্রদান করা)
- إيفاء العهد (চুক্তি পূর্ণ করা)

- الصبر في البأساء (অভাব-অনটনে সবর করা)
- الصبر في الضراء (অসুস্থতায় সবর করা)
- الصبر وقت البأس (যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা)

৩য় স্থানটি হলো, সূরা আলে-ইমরানের ১৩৩-১৩৫ নং আয়াত-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)

"এবং নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা ঐসব লোক যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা নিজেদের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আর আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন। আর তারা যখন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলে, (তখনি) আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তারা তাদের গুনাহের কারণে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করতে পাারে? আর তারা জেনে শুনে তাদের (মন্দ) কর্মে অবিচল থাকে না।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৫]

এ আয়াতগুলোতে প্রাপ্ত গুণাবলি-

- إنفاق في السراء (স্বচ্ছল অবস্থায় দান করা)
- إنفاق في الضراء (অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করা)
- كظم الغيظ (গোস্বা দমন করা)
- العفو عن الناس (মানুষকে ক্ষমা করা)
- ذكر الله والاستغفار بعد الذنب من غير تأخير

গুনাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করা এবং তাওবা-ইস্তেগফার করে ফিরে আসা

- عدم الإصرار على الذنب. (গুনাহের উপর স্থির না থাকা)

এখানে লক্ষ করে দেখুন, মুত্তাকীদের অনেকগুলো সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এক জায়গায়ও এ কথা বলা হয়নি যে, সিয়াম পালন করা মুত্তাকীদের সিফাত। কারণ সিয়াম তো হলো, তাকওয়া অর্জনের বিশেষ কোর্স। তাই সিয়াম পালনকে আলাদাভাবে সিফাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

সিয়াম পালন মানে মুত্তাকী হয়ে যাওয়া নয়। বরং সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়ার কোর্স করা হয়ে থাকে। মুত্তাকী হতে হলে কী কী গুণ লাগবে এগুলো তো আমরা উপরের তিনটি আয়াতে বেশ সমৃদ্ধভাবে পেয়েই গেছি। এর অর্থ হলো, সিয়াম পালন কালে আমরা তাকওয়ার কোর্সে ওই সিফাতগুলো অর্জন হচ্ছে কিনা সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

তাহলে প্রথম কথা হলো, যখন আমাদের রমযান শুরু হয়ে যাবে তখন সিয়াম পালনকালে আমাদের মধ্যে উপর্যুক্ত গুণগুলো স্থিরভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা এই ফিকির রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা দুর্বল। সবসময়ই দুর্বল। তাই রমযান আসার পর থেকে যদি ফিকির শুরু করি তাহলে শুরু করতে করতে রমযান হয়তো আমাদের থেকে বিদায় নিবে। আল্লাহ হেফাযত করুন। রমযানকে আপন করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন।

রমযানের আগেই রমযানের প্রস্তুতি নিবো কেন?

বান্দার উপর তার হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর তরফ থেকে নেয়ামত। যখন বান্দা এ নেয়ামতের শোকর আদায় করে, আল্লাহ নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন, বান্দাকে আরও তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَئِن شكرتم لأزيدنكم. —إبراهيم: 7

"যদি তোমরা শোকর আদায় কর, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিব।" -সূরা ইবরাহীম ১৪:০৭

মনে রাখবেন, আমরা সবাই ভুলে গেলেও আল্লাহ ভুলেন না। আপনি আল্লাহর দেওয়া ছোট থেকে ছোট নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবেন, আর সেটা আল্লাহর নজর থেকে ছুটে যাবে বা আল্লাহ সে

শুকরিয়ার মূল্যায়ন করবেন না; তা কখনোই হতে পারে না। আল্লাহ এর থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. –الدهر: 22

“তোমাদের চেষ্টাগুলো সবসময় মূল্যায়িত হয়” -সূরা দাহর ৭৬: ২২

(كَانَ) এই শব্দটিই বলে দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। সবসময় এমনই হয়ে আসছে।

গভীর রাতে অনেক সময় নিজের অজান্তেই বান্দার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মূলত রাব্বুল আলামীন গাফেল বান্দাকেও এভাবে মাঝে মাঝে জাগ্রত করে দেন। কিন্তু যদি বান্দা ওই সুযোগটি কাজে লাগায় তাহলে সে তার হায়াতের গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টির মূল্যায়ন করার কারণে দেখা যাবে, আল্লাহ তাকে পরবর্তীতে আরও উঠার তাওফীক দিবেন। এভাবে এক সময় আরও আগে উঠার সে তাওফীকপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে বান্দা যখন সেটাকে কদর না করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে ধীরে ধীরে তার গাফলত আরও চেপে বসে। এক সময় দেখা যায় তার ফজরের জামাত ছুটে যায়। আর এই অবমূল্যায়ন যদি চলতেই থাকে তাহলে এক সময় ফজরও কাযা হয়ে যায়।

এভাবে প্রতিটি মুহূর্তের শোকর (মূল্যায়ন) বান্দাকে আগে বাড়িয়ে দেয়। আর প্রতিটি মুহূর্তের না-শোকর (অবমূল্যায়ন) বান্দাকে পিছিয়ে দেয়। এটাই চরম বাস্তবতা।

তাই আল্লাহ যখন দেখবেন বান্দা রমযানের আগেই সময়গুলোর কদর করছে, বেশি বেশি ইবাদতের চেষ্টা করছে, মুত্তাকীদের গুণগুলো অর্জনের চেষ্টা করছে; তখন রমযানে আল্লাহ তাকে আরও নেয়ামত

বাড়িয়ে দিবেন, নেক আমলের আরও বেশি তাওফীক দান করবেন, তাকওয়ার গুণগুলো তাকে দিয়েই দিবেন ইনশাআল্লাহ।

তাছাড়া পুরোটা বছর আমরা কত কত গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি। জানা-অজানা নানা গুনাহে লিপ্ত হই। সুতরাং পুরো **১১** মাসের মন্দ আমল ও বাজে অভ্যাসগুলো যদি কোনো বাধা ছাড়াই রমযানে প্রবেশ করে তাহলে রমযানে এসে সেগুলোতে ব্রেক দিতে দিতে রমযানের বেশিরভাগ সময় চলে যাবে; রমযান থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই আমার মন্দ আমল এবং বাজে অভ্যাসগুলো যেন রমযানের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় না ফেলতে পারে, এর জন্য আগে থেকে ব্রেক দিতে হবে।

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রস্তুতি হলো-

১। তাওবার মাধ্যমে রমযানের পূর্বেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসা

বছরে ইবাদতের সবচেয়ে বড় আয়োজনের নাম রমযান। যেকোনো মাহফিলে বা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মূল আয়োজন যেদিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কেউই সেদিন থেকে প্রস্তুতি শুরু করে না। পৃথিবীর কোনো আয়োজনে এমন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না। আয়োজন যত বড় ধরনের হয়, তার প্রস্তুতি তত আগে থেকে শুরু হয়। কোনো আয়োজনের প্রস্তুতি যদি মূল আয়োজনের দিন থেকে শুরু হয়, বুঝতে হবে সে আয়োজন হয় খুবই ছোট অথবা আয়োজকদের কাছে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নয়।

আয়োজন কতটা গোছানো ও সুন্দর হবে তা নির্ধারণ করা হবে, এর জন্য প্রস্তুতি কী ধরনের নেওয়া হয়েছে তারই আলোকে।

আমরা তো ঊর্ধ্বজগতের বিষয়গুলো দেখি না। যদি দেখার সুযোগ থাকতো তাহলে হয়তো রমযানকে কেন্দ্র করে ফেরেশতাদের অনেক ছুটাছুটি আমরা দেখতে পেতাম। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করার জন্য তারা ছুটাছুটি করছে। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়ার জন্য এবং শয়তানদের শিকল পড়ানোর জন্য ছুটাছুটিতে তারা ব্যস্ত।

রমযানে আল্লাহর নেক বান্দাদের কত অগণিত নেক আমল ঊর্ধ্বজগতে উঠবে। সেগুলো নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের মাঝে প্রস্তুতিপর্ব চলমান থাকে। কে কোন আমল নিয়ে উপরে উঠবে? কার দায়িত্বে কী থাকবে সে সব দায়িত্ব বিলি-বণ্টনের বিষয় নিয়ে তারা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে... । রোযার মতো বিশেষ আমল, যার প্রতিদান স্বয়ং রাব্বুল আলামীন দিবেন, এই সুমহান ও মহাগুরুত্বপূর্ণ আমলকে বহন করে নেয়ার যিম্মাদারী নিয়েই তাদের ছুটাছুটি ও কর্মতৎপরতার নানা আয়োজন। এমন আরও কত কিছুই না আমরা দেখতে পারতাম, যদি দেখা সম্ভব হতো!

সিয়াম: ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্ক গড়ার অন্যতম উপায়

এগুলো ভাবার বিষয়। বান্দার সিয়ামের আমলটি দেখার জন্য আল্লাহ তাআলা অপেক্ষায় আছেন। এই আমল নিয়ে বান্দা যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন এর বদলা আল্লাহ তাআলা সরাসরি বান্দাকে দিবেন। তখন কেমন আনন্দ হবে সেটা আল্লাহই জানেন।

অন্যান্য ইবাদতের বদলা সরাসরি আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দিবেন, এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদীসটিতে কতটা মহব্বতের প্রকাশ ঘটেছে একটু লক্ষ করুন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ". (مسند أحمد: 4256)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তাআলা বনি আদমের প্রতিটি নেক আমলের বদলা দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত দান করেন। তবে রোযার বিষয়টি ভিন্ন। (কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,) রোযা আমার। তাই এর প্রতিদান আমি (নিজে) দিব। রোযাদার ব্যক্তির দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময়। অপরটি কিয়ামতের দিন (রবের সাক্ষাতের সময়)। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।” [মুসনাদে আহমদ: ৪২৫৬]

হাদীসটি ব্যাখ্যা করা যাক-

আরবীতে (الكتاب لي) কথাটির অর্থ হলো, কিতাবটি আমার। এর সাথে মিলালে (الصومُ لي) কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, রোযা আমার।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ঈমান হলো, অন্তরের ইবাদত। সালাত ও সিয়াম হলো, নিরঙ্কুশ শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত নিরঙ্কুশ আর্থিক ইবাদত। আর হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমষ্টি।

যদিও ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো, সালাত; কিন্তু সালাত ও সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো, সালাতে বান্দা যেসব কাজ করে এগুলো শুধুই বান্দার শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সালাতে বান্দা রবের সামনে মাথা ঝুঁকায়, মস্তক মাটিতে লুটায়।

পক্ষান্তরে সিয়াম এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহর শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা পানাহার থেকে পবিত্র। স্ত্রী, সন্তানাদি থেকে পবিত্র। সুতরাং বান্দা যখন সিয়ামের আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে তখন কেমন যেন রব বলবেন, আমার বান্দা আমারই নির্দেশে আমার মতো কাজ করে দেখিয়েছে। সে পানাহার ও শাহওয়াত থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং সে যা করেছে সেটি আমার। অন্যান্য ইবাদত তার নিজের। সুতরাং সে যেহেতু আমার কাজটি করে দেখিয়েছে, তাই তাকে আমি নিজ হাতে প্রতিদান দেব। মূলত সিয়ামের মাধ্যমে বান্দার ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্ক খুব দ্রুত ঘটে।

এ আমলটি আল্লাহর কাছে এতটাই প্রিয় যে, তা নিয়ে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন দশ গুণ আর সাতশত গুণ, এসবের হিসাব থাকবে না। তখন তিনি বান্দাকে কী দিবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। শুধু যা দরকার তা হলো, বান্দা যেন ইহতিসাবের সাথে রোযাগুলো রাখে। আমরা আল্লাহর নির্দেশে পানাহার ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছি, এই অনুভূতি ধারন করব এবং এর বিনিময় আমরা সরাসরি রবের কাছ থেকে পাব, এই বোধ নিয়ে রোজাগুলো রাখতে থাকব। সবাই করছে, তাই আমিও করছি... যদি এমন মানসিকতা ও অভ্যাসের সঙ্গে সিয়ামগুলো রাখি, তবে তাতে সিয়ামের প্রকৃত মাহাত্ম্য

অর্জিত হবে না। সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর সাথে এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিরাট মাধ্যম। সুতরাং এখানে এসে যদি আল্লাহ চেয়ে থাকেন বান্দার দিকে, আর বান্দা চেয়ে থাকে আরেকজনের দিকে; তাহলে সেই সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হবে? তাই অন্যের দিকে না তাকিয়ে সিয়াম পালন করতে হবে শুধুই আল্লাহর হুকুমের দিকে তাকিয়ে। আর এটাই হলো, ইহতিসাব।

সিয়ামের মধ্যে মহব্বতের পর্যায়টা বুঝার জন্য হাদীসের শেষাংশই যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে, "রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়"।

মানুষ যখন পানাহার থেকে বিরত থাকে তখন দুটি বিষয় ঘটে। মুখের ভেতরে নাড়াচাড়া বন্ধ থাকে। ফলে মুখের মধ্যে একটা গুমোট গন্ধ তৈরি হয়। আবার পেট খালি থাকার কারণে ভেতর থেকেও একটা গুমোট গন্ধ বের হয়। এই সবটাই হয় আল্লাহর নির্দেশে পানাহার পরিত্যাগের কারণে। তাই আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে গুমোট গন্ধ তৈরি হলেও তা আল্লাহর কাছে অনেক দামি হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে তা মিশকের ন্যায় সুগন্ধিময় হয়, যদিও আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি না। একইভাবে মানুষের দেহ থেকে প্রবাহিত রক্ত যখন বের হয়ে আসে আমরা বলি যে, এই রক্ত নাপাক। এবং এর কারণে ওযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু এই নাপাক রক্তই যখন আল্লাহর দ্বীনের জন্য কারো দেহ থেকে ঝরে, তখন যেহেতু আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে ঝরেছে তাই কিয়ামতের দিন এই (নাপাক) রক্ত থেকেই

মিশকের সুগন্ধি বের হতে থাকবে। মূলত আল্লাহর হুকুমকে কেন্দ্র করেই সবকিছুর ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকে।

যাই হোক কথা লম্বা হয়ে গেল...
এমন মহান রব যিনি আমাদের মতো তুচ্ছ বান্দাদের রোযার প্রতিদান স্বয়ং নিজে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, যার কাছে রোযামুখে আমাদের শুকনো মুখের গন্ধ মিশকের চেয়ে বেশি প্রিয়, এমন রবের দিকে আমাদের অবশ্যই ফিরে আসা উচিত। রমযানে নয়, রমযানের আগেই ফিরে আসা উচিত।

রমযান শুরু হলে ফিরে আসবো এমন পরিকল্পনা নয়, বরং এখনই ফিরে আসার সংকল্প করি। আমাদের এখনকার চেষ্টার উপর সামনের ফয়সালা হবে।

বান্দার দিকে আল্লাহর ক্ষমা দ্বিগুণ গতিতে ছুটে

নিম্নোক্ত আয়াতটির অর্থ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি সবাই...

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) –آل عمران: 133-135

“এবং নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা ঐসব লোক যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা নিজেদের ক্রোধ হজম

করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আর আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন। আর তারা যখন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলে, (তখনি) আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তারা তাদের গুনাহের কারণে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করতে পাারে? আর তারা জেনে শুনে তাদের (মন্দ) কর্মে অবিচল থাকে না।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৫]

এখানে প্রথম আয়াতটি লক্ষ করুন। আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে মাগফিরাতের দিকে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। লক্ষণীয় হলো, (سَارِعُوا) শব্দটি বাবে মুফাআলা থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীরে মাতুরিদিতে এসেছে-

(سَارِعُوا) শব্দটি যেহেতু বাবে মুফাআলা থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এখানে ছুটে আসা উভয়পক্ষ থেকেই হবে। বাবে মুফাআলার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, দুই পক্ষ থেকেই কাজটি পাওয়া যাওয়া।

সুতরাং আয়াতে যেহেতু বলা হয়েছে (سَارِعُوا) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ক্ষমার দিকে ছুটে আসো, বুঝা যাচ্ছে, তোমরা ক্ষমার দিকে ছুটলে, ক্ষমাও তোমাদের দিকে ছুটে আসবে।

প্রিয় ভাইগণ! আপনারাই বলুন, এখানে উভয় তরফের প্রতিযোগিতায় কোন্ পক্ষ এগিয়ে থাকবে? বান্দা, নাকি আল্লাহর ক্ষমা?

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. —صحيح البخاري: 7536 صحيح مسلم: 2675

“বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক বা’ (باع) পরিমাণ (সোজা দাঁড়িয়ে দুহাত দুদিকে প্রসারিত করলে যেটুকু হয়) অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।” -সহীহ বুখারী: ৭৫৩৬; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫

ক্ষমার গতির এক অনন্য উদাহরণ

বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ১০০ জনকে হত্যা করার পর তওবার উদ্দেশ্যে যখন ভালো লোকদের বস্তির দিকে রওয়ানা হলো, পথিমধ্যে তার মৃত্যু ঘটলো। তখন রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা উভয়পক্ষই তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলো। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা অপর এক ফেরেশতাকে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য পাঠালেন। সেই ফেরেশতা এসে ফায়সালা দিল, কোনদিকে পথ বেশি, আর কোনদিকে কম; সে হিসেবে ফায়সালা হবে। যদি ভালো লোকদের বস্তির দিকে সে বেশি পথ গিয়ে থাকে তাহলে রহমতের ফেরেশতারা রূহ নিবে। আর যদি কম গিয়ে থাকে তাহলে আযাবের ফেরেশতারা নিবে।

মূলত সেই ব্যক্তি কম পথ অতিক্রম করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালো লোকদের বস্তিকে কাছে এনে দিলেন আর পিছনে রেখে আসা মন্দ লোকদের বস্তিকে দূর করে দিলেন। মুসনাদে আহমদে এসেছে-

فَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، وَبَاعَدَ عَنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ، فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِهَا

(সুতরাং আল্লাহ নেককারদের বস্তি তার কাছাকাছি করে দিলেন, আর বদকারদের বস্তিকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তাকে নেককারদের সাথে যুক্ত করে নিল।)

গভীরভাবে লক্ষ করলে এ হাদীসেও মূলত আমরা আল্লাহ তাআলার একই নীতি দেখতে পাই। অর্থাৎ সে যখন আল্লাহর ক্ষমার দিকে সামান্য পথও অতিক্রম করলো, আল্লাহর ক্ষমা তার দিকে দ্বিগুণ গতিতে ছুটে আসলো। তাই নেক লোকদের বস্তি তার কাছাকাছি এনে দেয়া হলো।

আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল—গুনাহের পর ফিরে আসা

উপরের আয়াতে উল্লেখ হয়েছে,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) –آل عمران: 135

“এবং তারা যখন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলে, (তখনি) আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তারা তাদের গুনাহের কারণে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের (মন্দ) কর্মে অবিচল থাকে না।” -সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৫

মানুষ দুর্বল। সে ভুল করবেই। কিন্তু ভুল করে গো ধরে বসে থাকাটা দূষণীয়।

আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মুত্তাকী ব্যক্তিও গুনাহ করে ফেলতে পারে। এটা তাকওয়া পরিপন্থি নয়; যখন বান্দা সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে।

হ্যাঁ, তাকওয়ার পরিপন্থি হলো, গুনাহের পর ফিরে না আসা। ক্ষমা না চাওয়া।

এক হাদীসে এসেছে-

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ عَمِلْتُمْ بِالْخَطَايَا حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبْتُمْ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ»- الزهد والرقائق لابن المبارك: 1049

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি তোমরা এতটা গুনাহ কর যে, আসমান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে; অতঃপর তাওবা কর, আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করবেন।" -আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক: ১০৪৯

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. -رواه الترمذي(3540) وقال: هذا حديث حسن.

"হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে যত দোয়া করবে এবং আশা করবে, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব; তোমার যত পাপই থাকুক না কেন। কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোনো পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তুমি যদি জমিন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও, আর আমার সঙ্গে যদি কিছুর শরীক না করে থাক, তবে আমি সেই পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমাকে দান করব।" –জামে তিরমিযী: ৩৫৪০

জামে তিরমিযীতে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. –جامع الترمذي: 2499

"আদম সন্তান প্রত্যেকে গুনাহ করে, আর সর্বোত্তম তারাই, যারা গুনাহের পর ফিরে আসে।" -জামে তিরমিযী: ২৪৯৯

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ». –صحيح مسلم: 2749

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে হটিয়ে এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন, যারা গুনাহ করবে। অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তিনি ক্ষমা করে দিবেন।" -সহীহ মুসলিম: ২৭৪৯

বান্দা যে বান্দা, এটা তার গুনাহের পর অনুতপ্ত হওয়ার দ্বারা খুব বেশি ফুটে উঠে। তখন তার অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহর কাছে অনেক অনেক পছন্দের হয়।

দেখবেন, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যের একটি হলো, কোন বান্দা আল্লাহর কাছে হাত তুলে কান্নারত হয়ে ক্ষমা চাচ্ছে। এটা আপনি দেখলে আপনার কাছেই ভালো লাগবে। তাহলে যিনি তার খালেক, সেই খালেকের কাছে কেমন লাগবে?

যদি বান্দার গুনাহ না হতো, তাহলে সে ওজবের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত।

মাগফিরাত ও রহমত যেন সহোদরা বোন

মনে রাখবেন, আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত একসাথে চলে। যেখানে ক্ষমা, সেখানেই রহমত চলে আসবে। আর যেখানে বান্দা রহমত প্রাপ্ত হবে, সেখানেই ক্ষমা চলে আসবে। কুরআনে (غفور رحيم) একত্রে অগণিত জায়গায় এসেছে। এর বাইরে নিচের কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন...

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. –الحجر: 49

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" - সূরা হিজর **১৫: ৪৯**

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. –الكهف: 58

"তোমার ক্ষমাশীল রব রহমওয়ালা।" -সূরা কাহাফ **১৮: ৫৮**

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ – الزمر:53

"বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে; আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - সূরা যুমার **৩৯: ৫৩**

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– الأعراف:23

"তাঁরা বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" - সূরা আরাফ ০৭: ২৩

তাই রমযানে ও রমযানের আগে দুটার যেকোনো একটা মঞ্জুর করাতে পারলে অপরটা অটোমেটিক অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে, ক্ষমার অধিকারী হতে পারেন।

আবার বেশি বেশি ইবাদতে মাকসূদার দিকে ধাবিত হয়ে, মসজিদ মুখী হয়ে আপনি রহমত প্রাপ্ত হতে পারেন।

ইবাদত আমাদের জীবনের মূল মাকসূদ। ইবাদতের জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ইবাদত করার জন্য আমরা দিন-রাত নানা ধরনের আসবাবে ডুবে থাকি। তবে লক্ষ করুন, যখন আমরা মসজিদে গমন করি তখন সরাসরি মাকসূদে প্রবেশ করি। যেখানে শুধু রহমতই রহমত। তাই আমরা দোয়া পড়ি-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের সব দরজা খুলে দিন।)

আসবাবকেও মাকসূদ বানিয়ে দেওয়ার সুন্দর উপায় আছে। সংক্ষেপে বললে দুইভাবে আসবাবগুলোকে মাকসূদ বানিয়ে দেওয়া যায়। এক. আসবাবগুলোকে সুন্নত তরিকায় আদায় করা। দুই. আসবাবগুলো পালনকালে বেশি বেশি যিকরুল্লাহয় লিপ্ত থাকা। মূলত যিকরুল্লাহ হলো সবচেয়ে বড় মাকসাদ। তাই যিকরুল্লাহকে কুরআনে সবচেয়ে বড় বলা হয়েছে। (وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ) তাই যিকরুল্লাহ দিয়ে ইবাদতে মাকসূদাহগুলো আরও উন্নত রূপ ধারণ করে। আর যিকরুল্লাহ দিয়ে আমাদের জীবনের আসবাবগুলোকে মাকসূদ বানিয়ে দেওয়া যায়। যখন আমরা আসবাবের মধ্যে ডুবে থাকি, তখন যিকরুল্লাহ জারি থাকলে সেই সময়গুলোও আমার জীবনের মাকসূদে পরিণত হয়।

এ কারণেই কুরআন হাদীসে অধিক যিকির তথা দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, মানযিলে মাকসাদে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। আপনি হাঁটছেন কোনো একটি মাকসাদে। এই হাঁটা যা কয়েকটি মাধ্যম পেরিয়ে হয়তো মূল মাকসাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে, কিন্তু আপনি যিকরুল্লাহ'র মাধ্যমে আসবাবগুলো পালনের সময়গুলোকেও মাকসূদ বানিয়ে দিতে পারছেন।

আর বান্দা যত বেশি নিজেকে মূল মাকসূদের সাথে জুড়ে রাখতে পারবে, ততবেশি সে রহমত প্রাপ্ত হবে।

ক্ষমা ও রহমত বান্দার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

আমরা নামাযের শেষে যে দোয়ায়ে মাসূরাহ পড়ি সেখানে শেষ কথাগুলো দেখুন..

فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم

... "সুতরাং আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাত দান করুন এবং দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

জিহাদের আমলে রহমত ও মাগফিরাত রয়েছে।

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) –النساء: 95، 96

"যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহাপুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজের পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -সূরা নিসা ০৪: ৯৫-৯৬

অপর এক আয়াতে-

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) –آل عمران: 157

"তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও, তবুও আল্লাহর পক্ষ হতে (প্রাপ্তব্য) মাগফিরাত ও রহমত সেই সব বস্তু হতে ঢের শ্রেয়, যা তারা সঞ্চয় করেছ।" -সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৫৭

সুতরাং যদি কেউ জিহাদের জন্য প্রচেষ্টা করে, দৌড়ঝাপ করে, সে অনেক অনেক রহমত এবং মাগফিরাতের উপযুক্ত হয়ে যাবে।

সহীহ মুসলিমে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين".– صحيح مسلم

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন রমযান শুরু হয় রহমতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের জিঞ্জির পড়িয়ে দেয়া হয়।" [সহীহ মুসলিম: ১০৭৯]

আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করি সেক্ষেত্রেও এমন একটি দোয়া আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেখানে রহমতের সব দরজা খুলে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। (اللهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)

তবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রমযানের বাইরে স্থানের সাথে খাস থাকে। পক্ষান্তরে রমযানে কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট না থেকে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং রমযানের পুরো ত্রিশ দিনে বান্দা যেকোনো স্থানে অবস্থান করে রহমতের অবারিত বর্ষণে সিক্ত হতে পারে।

এ কারণেই রহমতের এমন অবারিত মৌসুমেও যখন কেউ আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে না পারে, তার জন্য হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বদদোয়া করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ‘আমীন’ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা রমযান আসার পূর্বেই আমাদেরকে পূর্ণ ক্ষমা করে দিন এবং রমযানে খুলে যাওয়া রহমতের সকল দরজা থেকে প্রতিটি মুহূর্তে রহমত অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

***

আপনার নামায সুন্দর থেকে সুন্দরতর করুন

৩য় মজলিস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

আমরা যেসব বিষয়ের উন্নতি চাই, যদি তার অনুশীলন রমযানের পূর্বেই শুরু করা যায়, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা আমাদের এ প্রচেষ্টার উত্তম জাযা দিবেন এবং আমাদেরকে রমযান সঠিকভাবে পালন করার তাওফীক দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তুতি হলো-

০২. এখন থেকেই নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করা

নামাযের বিষয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক উক্তি

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের কাছে যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন তার বর্ণনা মুয়াত্তা মালেকে এসেছে-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. -6/1 ط. دار إحياء التراث العربي

"নিশ্চয় আমার নিকট তোমাদের যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, নামায। যে নামাযের হেফাযত করবে এবং ধারাবাহিকভাবে সাথে সংরক্ষণ করতে থাকবে, সে তো তার দ্বীনের হেফাযত করলো। আর যে নামায নষ্ট করলো, সে অন্য সকল বিষয় আরও বেশি নষ্ট করবে।" [মুয়াত্তা মালেক: ১/৬]

আমরাও যদি এই নীতির উপর চলতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনেও বরকত আসবে। অন্য সকল কাজ আরও সুন্দরভাবে আঞ্জাম পাবে।

একটি চমৎকার মূলনীতি

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. —البقرة: 238

"তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান থাক এবং তোমরা আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।" –সূরা বাকারা ০২: ২৩৮

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম মাতুরিদী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে মাতুরিদীতে বলেন, (حَافِظُوا) শব্দটি যেহেতু বাবে মুফাআলাহ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তার মধ্যে সংরক্ষণের বিষয়টি দুই তরফ থেকেই থাকবে। অর্থাৎ বান্দা যখন নামাযকে যথাযথভাবে হেফাযত করবে, তখন নামাযও বান্দাকে হেফাযত করতে থাকবে। এ কারণেই অপর এক আয়াতে এসেছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. —العنكبوت: 45

"নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে।" -সূরা আনকাবুত ২৯: ৪৫

নামাযের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো দৃঢ়তার সাথে অনুশীলন করতে পারি

অযুতে মিসওয়াক যেন না ছুটে

মানুষের মুখের ভেতরে আল্লাহ তাআলা যে লালা দিয়েছেন, তা খুব দ্রুত যেকোনো খাবারকে হজমের উপযুক্ত করে ফেলে, পঁচিয়ে ফেলে। তাই আমরা দেখি, মুখ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখলে মুখে দুর্গন্ধ হয়ে যায়।

মানুষ যখন ঘুম থেকে উঠে, দীর্ঘসময় মুখ বন্ধ থাকার কারণে ভেতরের লালাগুলোর কারণে দুর্গন্ধ হয়। এ কারণে শুধু মিসওয়াক করলেই মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতেন আমরা জানি। দাঁত পরিচ্ছন্ন করার জন্য মিসওয়াক করতেন। আবার মিসওয়াক দিয়ে জিহ্বা পরিষ্কার করতেন। জিহ্বা পরিষ্কার রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। আবার দেখেন শুধু কুলি করলে মুখের ভেতরের অংশের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই খুব গুরুত্বের সাথে ভালো করে কুলি করতেন। একটু লক্ষ করি, এভাবে যদি নিয়মিত করা হয়, তাহলে মুখে কোনো ধরনের দুর্গন্ধ থাকার সুযোগ কি আছে? [দেখুন, সহীহ মুসলিম: ২৫৪]
মানুষ যখন একে অপরের সাথে কথা বলে, তখন মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসলে সামনের ব্যক্তি সার্বক্ষণিক কষ্ট পেতে থাকে। এগুলো প্রত্যেকের লক্ষ করা উচিত।
তবে আরেকটি বিষয়। কারো মুখে দুর্গন্ধ হলে তাকে সরাসরি লজ্জিত করাও উচিত নয়। এর দ্বারা সে অনেক বেশি কষ্ট পায়, অনেক সময় সবার সামনে কাউকে সরাসরি বলা হলে সে অনেক বেশি লজ্জিত হয়।
আমরা হাদীসের ভাণ্ডার খুঁজে একটি হাদীসও পাব না, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সরাসরি এমন কিছু বলে লজ্জিত করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাটা ছিল এমন যে, সবাই বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এতবেশি মিসওয়াক করতেন যেন তাঁর মাড়ির চামড়া উঠে যাবে। এগুলো সাহাবায়ে কেরাম প্রচুর

পরিমাণে দেখেছেন। এতবেশি দেখেছেন যে, তাঁরা দেখে দেখে শিখে ফেলেছেন। তাঁদেরকে আলাদাভাবে তাম্বীহ করতে হয়নি।

হাদীসে এসেছে—হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম মিসওয়াকের আমলটি করতেন। এমনকি মৃত্যুর সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাহ্যিক আমল ছিল উত্তমরূপে মিসওয়াক। উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আর কী হতে পারে? [দেখুন: সহীহ বুখারী: ৪৪৫১; সহীহ মুসলিম: ২৫৩; আল-মুজামুল আওসাত: ৬৫২৫]

অধিক পরিমাণে মিসওয়াকের আরেকটি ভালো দিক হলো, কিছু সময় পর পর মিসওয়াক করা হলে নতুন করে সজীবতা তৈরি হয় এবং কাজে উদ্যম আসে। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়। সুতরাং যার রিসালাত পুরো বিশ্ববাসীর জন্য এবং যার ফিকির কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য, তাঁর উদ্যম স্বাভাবিকভাবেই অনেক অনেক বেশি থাকার কথা।

তাই আমাদেরও উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বাইরেও মাঝে মাঝে মিসওয়াক করা। এতে করে কাজে উদ্যম আসবে, মিসওয়াকের সাথে সম্পর্কও গভীর হবে ইনশাআল্লাহ।

অযুতে পানি অপচয় না হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর ক্ষেত্রে পানি অপচয়ের ব্যাপারে জনৈক সাহাবীকে তাম্বীহ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟» قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.
—سنن ابن ماجه: 425

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি অযু করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সাদ! এটা কি ধরনের অপচয়?" তখন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "অযুতেও অপচয় হয়?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহিত নদীতে অযু কর।" -সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫

বিষয়টির গভীরতা উপলব্ধি করা উচিত। নদীর পানি নদীতেই থেকে যাচ্ছে, তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাম্বীহ করছেন। মূলত পানির মতো এতবড় নেয়ামতের কদর যেন উম্মত শিখে তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। লক্ষ করুন, এখানে অযুতে পানি অপচয়কে 'সারাফ' বলা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. —الأنعام: 141

"আর তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" -সূরা আনআম ০৬: ১৪১

সুতরাং যে অযুতে আল্লাহ তাআলাকে নারাজ করে আসা হয়েছে, সে অযু দিয়ে আমরা সুন্দর নামায কীভাবে আশা করতে পারি?

হাদীসে মূলত আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন যেন না হয়, তা শিখানো হয়েছে। আমরা অঢেল পেয়েছি বিধায় অযথা অঢেল খরচ করব, এই দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ পছন্দ করেন না।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দেয়া ছোট ছোট নেয়ামতকেও আমাদের নিকট বড় করে দেখাতেন। [দেখুন, শামায়েলে তিরমিযী: ২২৬] এখানে দ্বীনের মানসিকতাটা শিখার বিষয়।

যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে টেপ থেকে অযু করলেও এক বদনার চেয়েও কম পানি ব্যবহার করে অযু করা যায়। আমরা টেপে অযু করে অযুর পানিটা বালতিতে জমা করে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

অযুর পর কালিমায়ে শাহাদাহ ও দোয়া পড়া

সুনানে তিরমিযীতে এসেছে-

من توضأ فأحسن الوضوءَ ثم قال : أشهد أن لا إلهَ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ، يدخل من أيِّها شاءَ. —رواه الترمذي: 55

যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করার পর এই কথা বলবে,

(أشهد أن لا إلهَ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে, সে যেটা দিয়ে চাইবে প্রবেশ করবে। -জামে তিরমিযী: ৫৫

(দোয়ার অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মিক পবিত্রতা দান করুন এবং আমাকে বাহ্যিক পবিত্রতাও দান করুন।)

মনে রাখব, আমরা নামাযের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকে সুন্দর করতে চাচ্ছি। তাই চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে বেষ্টন করে আসতে হবে। সৌন্দর্যের চাদরে নামাযকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে।

আমরা অনেক সময় দোয়া পড়ি, দোয়া করি না। দোয়া পড়াটা অনেকটা পাখির কথা বলার মতো হয়ে যায়। কী বলছি সেটার বিন্দুমাত্র অনুভূতি মনে থাকে না। তাই আমাদেরকে দোয়াগুলো বুঝে বুঝে করতে হবে। শুধু আওড়ে গেলে ওই মাপের ফায়দা অর্জিত হবে না।

এটি অনেক উঁচু মাপের ফযীলতের হাদীস। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে এসেছে যে, তাঁকে জান্নাতের সকল দরজা-ই ডাকতে থাকবে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, তাঁর এই ফযীলতের কারণ হলো, তাঁর মাঝে সব ধরনের গুণের সমাবেশ ঘটেছে। [দেখুন, সহীহ বুখারী: ১৮৯৭]

একইভাবে উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাপারেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি উত্তমভাবে অযু করে এই দোয়া পড়ে, তাহলে এই অযু যেহেতু ইসলামের সবচেয়ে বড় ইবাদতের জন্য মাধ্যম, তাই এই বড় ইবাদতই তার জন্য অন্য সকল ইবাদতের পথ খুলে দিবে। তবে জরুরি হলো, এই নামায সুন্দর হতে হবে এবং এর জন্য করা অযুও

সুন্দর হতে হবে। এখানে কালিমায়ে শাহাদার মাধ্যমে মূলত ঈমান ও সর্বোত্তম ইবাদতের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তার জন্য এতবড় ফযীলত অর্জিত হবে।

জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করুন

সহীহ বুখারীতে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». —صحيح البخاري: 645

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একাকী নামাযের চেয়ে জামাতে আদায়কৃত নামায ২৭গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। [সহীহ বুখারী: ৬৪৫]

এগুলো এতই ফযীলতের বিষয় যে, কেউ হয়তো ৫০ বছর হায়াত পেয়েছে। কিন্তু এগুলোর কারণে তার হায়াত কয়েক হাজার বছরের সমান হয়ে যায়। একজন ৫০ বছরে একই ইবাদত করে যা অর্জন করে, অপরজন একই ইবাদত একটু তরীকা অনুযায়ী করার কারণে ৫০ হাজার বছরের কাজ করে ফেলে।

মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করুন

মুসতাদরাকে হাকেমে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ». –المستدرك: 898

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ছাড়া কোনো নামাযই নেই।" -মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৯৮

মসজিদে গিয়ে সামনের কাতারে থাকার চেষ্টা করব। মনে রাখব, যারা সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, তারা কল্যাণের পথে অগ্রগামী থাকে। আর যাদেরকে দেখব সামনে কাতার ফাঁকা রেখে পেছনে দাঁড়াতে পছন্দ করে, বুঝব যে, তারা দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পেছনে পড়ে থাকাকেই পছন্দ করে।

আল্লাহর পথের সকল মুজাহিদ এ বিষয়ে সজাগ থাকা চাই।

নামাযের আগে ও পরে ফারেগ থাকুন

নামাযের আগেই ব্যস্ততা থেকে ফারেগ হয়ে যাওয়া। নামাযের পরপরও ব্যস্ততা না রাখা। তাহলে নামায সুন্দর হবে, মানসম্পন্ন হবে।

নামাযে দিলকে আল্লাহর জন্য ফারেগ রাখুন। এমন কোনো কাজ করে এসে তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়াবেন না, যেটা নামাযেও আমাদেরকে সেদিকে টানতে থাকে। অথবা এমন কোনো ব্যস্ততা সামনে নিয়ে নামাযে দাঁড়াব না, যা আমাদের নামাযকে প্রভাবিত করতে থাকে।

অনেকে এত ব্যস্ততা নিয়ে নামাযে দাঁড়ায় যে, তার ব্যস্ততার প্রভাব পেছনে থাকা মাসবুক ব্যক্তির নামাযকেও প্রভাবিত করে। সে সালাম ফিরিয়েই জুতা হাতে নিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে। পেছনে নামাযরত ব্যক্তিকে পুরোটা সময় মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে রাখে। পেছনের ব্যক্তি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া তো দূরের কথা, তার সারাক্ষণই মনে হতে থাকে কত তাড়াতাড়ি নামাযটা শেষ করবো। আল্লাহ আমাদের ইসলাহ করুন।

আমরা নিজের এবং অন্য ভাইদের নামাযের হেফাযতের ফিকির করব। মোটকথা সকলের নামায যেন সংরক্ষিত হয়, আমরা সেই ফিকিরে নিবেদিত হব।

অনেক সময় কোনো কোনো মুসল্লী মসজিদে গিয়ে নিজের জুতা কিংবা সামানপত্র এমন জায়গায় রাখে যেখান থেকে খোয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবে জুতা কিংবা সামান রেখে নামাযে দাঁড়ানো অনুচিত। যত্নসহকারে তা নিজের কাছাকাছি হেফাযত করব। এই হেফাযত মূলত আমাদের নামায এবং আল্লাহর সাথে একাগ্রতাকে অব্যাহত রাখার জন্য।

অনেক সময় আমরা সামান কাছাকাছি রাখলেও, সামনে কাতার ফাঁকা থাকায় সামনে চলে যাই, আমাদের সামান কিংবা জুতা পিছনে রয়ে যায়। এমন দশায়ও দিলকে আল্লাহর জন্য ফারেগ করব। মনে মনে সেই সামানের ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করে, তা আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলকে ফারেগ করে দিব। এই সামান্য সামান খোয়া যাক অথবা যাই হোক- এটি যেন আমাদের মনিবের সাথে একাগ্রতায় কোনোক্রমেই অন্তরায় না হয়, এই চিন্তা অন্তরে জাগ্রত করব।

আমরা মসজিদে উপস্থিত হব জামাত শুরু হওয়ার পূর্বেই, যেন নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকার সুযোগ লাভ করতে পারি। যেন আমাদের অপেক্ষার সময়গুলোও নামাযরূপে গণ্য হয়। আর এর ফলে মূল নামাযে আমরা একাগ্রতা অনুভব করব। পূর্ববর্তী কোনো ব্যস্ততা থেকে থাকলে, সেই ব্যস্ততার রেশও এতে কেটে যাবে। এভাবে নামাযের জন্য ইনতেজার করার দ্বারা আমরা বিপুল ফায়দা অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

নামাযে অহেতুক নড়াচড়া পরিহার করার হিম্মত করব।

মনে রাখবেন, নামাযে আমরা যত বেশি স্থির থাকব ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারব, জিহাদেও তত বেশি দৃঢ়তা অব্যাহত রাখতে পারব ইনশাআল্লাহ।

যারা নামাযে দাঁড়িয়ে শরীর চুলকানোতে অভ্যস্ত, মশা বা মাছি বসলে অস্থির হয়ে যায়... এমন লোকজন নামাযে দাঁড়িয়ে এক অস্থিরতার মধ্যে থাকে। 'কী যেন পায়ে কামড় দিল', 'কী যেন গায়ে বসলো' এমন অনুভূতিতে সবসময়ই এরা আক্রান্ত থাকে।

কিন্তু আমরা যখন মনকে স্থির করে নিব যে, 'আমরা আল্লাহর সামনে অনেক বেশি স্থিরতা প্রদর্শন করতে চাই' তখন মশা-মাছি কোনো কিছুই আমাদের মনোযোগ অন্যত্র সরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং এভাবে মনোযোগ বজায় রাখাকে আমরা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করব, আল্লাহর সামনে দৃঢ় থাকার চ্যালেঞ্জ। এর দ্বারা 'নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার' বড় ফায়দা যেমন অর্জিত হবে, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। এরূপ উচ্চ মনোবল ও আত্মবিশ্বাস প্রতিটি মুজাহিদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়কে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই মুরাকাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দ্বারা আমাদের নামাযে খুশু পয়দা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. —البقرة: 45، 46

ভাবার্থ: "একমাত্র খুশুওয়ালা ছাড়া বাকি সকলের কাছেই নামায ভারি। আর খুশুর অধিকারী ওই সমস্ত লোক, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" -সূরা বাকারা ০২: ৪৫-৪৬

আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ফিকির বান্দার মধ্যে খুশু তৈরি করে। তাই নামাযের জন্য অপেক্ষা থাকাকালীন সময়কে 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে' অন্তরাত্মায় এই অনুভূতি সঞ্চার করে মুরাকাবা করব।

'আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে' এবং 'হিসাব দিতে হবে' এ ধরনের কিছু আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলো। নামাযের পূর্বে এ আয়াতগুলো মাথায় আনার চেষ্টা করব। নামাযে খুশু স্থায়ী হওয়ার জন্য বিইযনিল্লাহ এটি অত্যন্ত উপকারী একটি কৌশল।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) -القلم: 42، 43

অর্থ: "স্মরণ কর, সেদিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু

তারা সক্ষম হবে না; তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।” (সূরা কালাম ৬৮:৪২-৪৩)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) – الحاقة: 13–18

অর্থ: “যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, মাত্র এক ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সে দিন তা দুর্বল হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সে দিন আটজন ফেরেশতা তোমার রবের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।” (সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৩-১৮)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) –النبأ: 38–40

অর্থ: “সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। এই দিন সুনিশ্চিত; অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের

শরণাপন্ন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফের বলবে, 'হায় আমি যদি মাটি হতাম'। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৩৮-৪০)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) –الفجر: 21–30

অর্থ: "এটি সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, এবং যখন তোমার রব উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও, সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?' সেই দিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না। হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফজর ৮৯:২১-৩০)

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) – الكهف: 48، 49

অর্থ: “আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, ‘তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনও উপস্থিত করব না।’ আর উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটি কেমন কিতাব! এটি তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এতে সমস্ত হিসাব সংরক্ষিত রয়েছে।’ তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে, তোমার রব কারও প্রতি জুলুম করেন না।” (সূরা কাহাফ ১৮: ৪৮-৪৯)

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) –الأنعام: 30-32

অর্থ: “তুমি যদি দেখতে তাদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন, ‘এটি কি প্রকৃত সত্য নয়?’ তারা বলবে, ‘আমাদের রবের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য’। তিনি বলবেন, ‘তবে তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর’।

যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি হঠাৎ তাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, ‘হায়! এটিকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ।’ তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে; দেখ, তারা

যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি অনুধাবন কর না?” (সূরা আনআম ০৬:৩০-৩২)

যারা ওজরের কারণে মসজিদে যেতে পারেন না

যারা নিরাপত্তার কারণে কিংবা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো ওজরের কারণে মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতে পারেন না তাদের বিষয়ে বলব;

আল্লাহ তাআলার একটি উসূল আছে। বান্দা যখন সক্ষম হালাতে কোনো আমল জারি রাখে, কখনো সে অক্ষম হয়ে গেলেও তাকে সেই আমলের সাওয়াব তিনি দিতে থাকেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে-

«إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»- صحيح البخاري: 2996

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন বান্দা অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা সফরে থাকে; তখন সুস্থ অবস্থায় কিংবা মুকীম অবস্থায় যে আমল করতো, সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিখে দেয়া হয়।”) [দেখুন, সহীহ বুখারী: ২৯৯৬]

সুতরাং, আমরা যারা ওযর পেশ করি তারা যখন নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করি, তখন আমাদের অবস্থা কী হয়? তখন যদি মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের প্রতি তৎপর থাকি, তাহলে

আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা অক্ষম অবস্থায় আমাদেরকে সেই সাওয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

আসবাব ও মাকসাদ বিষয়ে কিছু কথা

যখন আমরা মসজিদে গমন করব, তখন এ কথা মাথায় রাখব যে, আমরা জীবনের মূল মাকসাদ বা উদ্দেশ্যের দিকে যাচ্ছি। তার আগ পর্যন্ত যা কিছু করছি সবই হলো মূল মাকসাদে পৌঁছার আসবাব বা মাধ্যম। কিন্তু এখন আমরা মাকসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আর এর জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন।
বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করলে আশা করি বুঝতে সহজ হবে....
দুনিয়া হচ্ছে দারুল আসবাব। মানুষ দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো কাজ করে থাকে। প্রতিটি কাজ এক একটি সবব। সবব মানে মাধ্যম। এভাবে প্রতিদিন মানুষ শত শত আসবাব গ্রহণ করে। প্রতিটি কাজের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আবার প্রতিটি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যের পিছনে আরও বড় উদ্দেশ্যও নিহিত থাকে। যেমন ধরুন, কেউ বাজারের দিকে রওয়ানা দিয়েছে; এখানে তার মাকসাদ থাকে বাজারে পৌঁছে বাজার করা। কিন্তু, বাজার করাটাই কি আমাদের চূড়ান্ত মাকসাদ? না। বরং এটাও আরেকটা মাকসাদে পৌঁছার জন্য মাধ্যম। তা হলো, ঘরের লোকদের খাবারের ব্যবস্থা করা। আবার, খাবার খাওয়াই কি আমাদের চূড়ান্ত মাকসাদ-উদ্দেশ্য? নিশ্চয় নয়। এভাবে আমরা প্রতিনিয়ত নানা আসবাবের চক্রে ঘুরতে থাকি।

আমাদের অনেকে দুনিয়ার এ আসবাবগুলোকে তার জীবনের মূল মাকসাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, আবার অনেকে তা পারে না। দুনিয়াতে অনেকে খাবার-দাবার আর টয়লেট করাকেই চূড়ান্ত মাকসাদ বানিয়ে ফেলে। খাবার খাওয়াটা তাদের কোনো মাকসাদে পৌঁছার জন্য সবব হয় না। তাই তাদের জীবন আর পশুর জীবনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না।

পক্ষান্তরে যারা খাবার খায় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তারা মূলত আগের সবগুলো সবব বা মাধ্যম গ্রহণ করে তার মানযিলে মাকসাদে (মূল গন্তব্যে) পৌঁছতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল, আমাদের প্রতিটি কাজে মূল মাকসাদ হবে, আল্লাহর ইবাদত। কেউ যখন আল্লাহর ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন সে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

বান্দা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন সে তাওয়াক্কুলের দোয়া পড়ে বের হয়।

بسم الله توكلتُ على اللهِ، لا حولَ ولاَ قوّةَ إلا باللهِ

অর্থ: "আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া (অসৎ কাজ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার) কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই ।"

আবার যখন ঘরে প্রবেশ করে তখনও সে তাওয়াক্কুলের দোয়া পড়ে।

بِسمِ اللهِ وَلَجْنَا وبسم الله خرجنا، وعلى اللهِ ربِّنا تَوَكَّلْنَا

অর্থ: "আল্লাহর নামেই প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই বের হলাম এবং তাঁর উপরই ভরসা করলাম।"

মনে রাখবেন, যেখানে আসবাব থাকবে সেখানে তাওয়াক্কুলের বিষয় থাকবে। কারণ প্রকৃত বান্দা আসবাবের উপর ভরসা করতে পারে

না। তাই আসবাব গ্রহণ করতে গিয়েই সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। তাওয়াক্কুল হলো, আসবাব থেকে আস্থা হটিয়ে শুধু আল্লাহর উপর আস্থা রাখার নাম।

মানুষের জীবনের হালাত তো দুটিই। হয় সে ঘরের বাইরে থাকবে, না হয় ঘরের ভেতরে। উভয় অবস্থায়ই সে প্রতিদিন শত শত, হাজার হাজার আসবাব গ্রহণ করে। ফলে সে তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আসবাবগুলো থেকে ইয়াকীন হটিয়ে আল্লাহর উপর ইয়াকীন স্থাপন করে। আর দোয়ার মাধ্যমে সে ঘোষণা দেয় যে, আয় আল্লাহ! আসবাবের দুনিয়াতে আমি ঘরে কিংবা ঘরের বাইরে যত আসবাব-মাধ্যম গ্রহণ করবো, এই আসবাব-মাধ্যমগুলো আমাকে কাছের কিংবা দূরের মাকসাদে পৌঁছাতে পারবে না, যদি না আপনি পৌঁছে দেন।

আমরা ঘর থেকে দোয়া পড়ে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বের হই। আর সিঁড়ি ধরে আমরা বহুতল ভবন থেকে নামা শুরু করে থাকি। আমাদের মাকসাদ হলো, সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় পৌঁছা। এখানে তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো, আয় আল্লাহ, এই সিঁড়ি আমাকে নিচতলায় পৌঁছাতে পারবে না, যদি না আপনি আমাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দেন।

লক্ষ করুন, সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় পৌঁছা হলো আমাদের আপাত একটি মাকসাদ; চূড়ান্ত মাকসাদ না।

মূলত আসবাব এমন জিনিস যার উপরে কোনোভাবেই আস্থা রাখা যায় না। উত্তম মজবুত সিঁড়ি মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে ঘরের লোকদের খাবার যোগাড় করার জন্য যখন আমরা ঘর থেকে বের হই, তখন দোয়া পড়ি এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

করি, এর অর্থ হলো, আমরা নিজেদেরকে রবের নিকট সঁপে দিলাম। যেন আমরা বলছি, আয় আল্লাহ! আমাদের মূল মাকসাদ তো হলো, আপনার ইবাদত করা। কিন্তু ইবাদতের জন্য বাজারে গিয়ে বিভিন্ন সওদা করতে হবে। বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে এবং তা রান্না করতে হবে। আর এই রান্না করা খাবার খেয়ে ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জন করব। অতএব মূল মাকসাদের আগের এত আসবাব, এগুলো আমাদেরকে মূল মাকসাদে পৌঁছাতে পারবে না, যদি না আপনি আমাদেরকে পৌঁছে দেন।

মনে রাখব, যেখানেই আসবাবের বিষয় থাকবে সেখানেই তাওয়াক্কুল থাকবে। কারণ, আসবাব এতই দুর্বল যে, তার উপর এক মুহূর্তের জন্যও ভরসা নেই। এটা আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। একটা উদারহণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হবে.... আসবাব এতটাই দুর্বল যে, অনেক সময় যেসব বিষয়কে আমরা হেদায়াতের আসবাব মনে করে থাকি, এগুলোই হয়তো আমাদের গোমরাহীর আসবাব হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন, (আল্লাহ না করুন) প্রসিদ্ধ কোনো আলেম বা প্রসিদ্ধ কোনো দাঈর পদস্খলন হলো। দেখা যাবে, তার পক্ষে অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ তার অবস্থান স্পষ্ট ভুলের উপর।

এক্ষেত্রে তার পক্ষে যেসব মানুষ দাঁড়াল এর কারণ কী? কারণ হয়তো ওই আলেম কিংবা দাঈর সাথে থাকা সুসম্পর্ক অথবা তার বিষয়ে সুধারণা।

একটু লক্ষ করুন...

একসময় হয়তো এই অনুসারীরা ওই আলেম কিংবা দাঈর সাথে সুসম্পর্ক অথবা সুধারণাকে হেদায়াতের সবব তথা মাধ্যম মনে করতো। কিন্তু এখন এটিই তাদের জন্য গোমরাহীর কারণ হয়ে গেল। এ কারণে আসবাবের উপর কোনো ভরসা করা যায় না। আমাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর করতে হবে।

আমরা নবীগণের মোযেজার কথা শুনি, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের কথা শুনি।

এগুলোর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে শিক্ষা দিতে চান তা হলো, আসবাবের এ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসের ন্যূনতম ক্ষমতা নেই। আসবাবের দুনিয়াতে আমরা দেখি যে, আগুন পুড়িয়ে দেয়। ছুরি কেটে দেয়। সমুদ্র ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, এগুলো আসবাব। এগুলোর সাথে সরাসরি পুড়িয়ে দেয়ার কিংবা কেটে ফেলার অথবা ডুবিয়ে দেয়ার সম্পর্ক নেই। বরং সবকিছুতেই সরাসরি সম্পর্ক হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের।

একটি আয়াত দেখেন,

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُون. —يوسف: 67

অর্থ: “আর ইয়াকুব বলল, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। (বস্তুত) আমি তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করতে পারবো না। একমাত্র আল্লাহর হুকুমই কার্যকর হয়। (সুতরাং) আমি

তাঁরই উপর ভরসা করলাম। আর যারা ভরসা করতে চায়, তাদের উচিত তাঁরই উপর ভরসা করা।" [সূরা ইউসুফ ১২: ৬৭]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১১ পুত্রকে লক্ষ করে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন। যেহেতু তাঁরা সুস্থ সবল সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল, তাই একসাথে এক ফটক দিয়ে ১১ ভাই প্রবেশ করলে, মানুষের বদনজর তাদের উপর পড়তে পারে। তাই বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে নগরের বিভিন্ন ফটক দিয়ে পৃথকভাবে প্রবেশ করতে বললেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি 'আল্লাহর হুকুমই হচ্ছে মূল' এই বিষয়টিও উল্লেখ করে দিলেন। আল্লাহর হুকুম থাকলে পৃথকভাবে প্রবেশ করলেও ক্ষতি হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে হুকুম না থাকলে একত্রে প্রবেশ করলেও ক্ষতি হবে না। সুতরাং আমি যা তোমাদেরকে নসীহত করলাম, তা শুধু বদনজর থেকে বাঁচার একটা সবব বা উপায় মাত্র। কিন্তু এই সববের উপর ভরসা করা যায় না।

আবার পূর্বের কথায় যাই...

আমাদের জীবনের মূল মাকসাদ কী? বাজার করা, খাবার খাওয়া, ঘুমানো, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি? নাকি এগুলো হলো আসবাব, আর মূল মাকসাদ হলো, ইবাদত?

যে যত কম আসবাব গ্রহণ করে মূল মাকসাদে পৌঁছতে পারে, সেই মূলত এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যাহেদ।

আসবাবগুলো যেহেতু আমাদের মাকসাদ না, তাই আমরা এগুলো গ্রহণ করার সময় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকি এবং তাঁর

নিকট দোয়া করি যে, আয় আল্লাহ! আসবাব গ্রহণ করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হিসেবে। কিন্তু এ আসবাবের মধ্যে মূল ক্ষমতা নেই। এ আসবাবগুলো যেন আমাদেরকে আটকে দিতে না পারে। আমরা যেন মূল মাকসাদে পৌঁছে যেতে পারি, আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন।

তো আমরা যখন মসজিদে যাই, তখন এ কথা মাথায় রাখব যে, আমরা আমাদের জীবনের মূল মাকসাদের দিকে যাচ্ছি। এর আগে যা কিছু করেছি, সবই ছিল মূল মাকসাদে পৌঁছার আসবাব (মাধ্যম)। কিন্তু এখন আমরা মাকসাদের দিকে যাচ্ছি। আর এর জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

একটি প্রশ্ন করি....

আমরা মসজিদে প্রবেশ করার সময় কি কেউ তাওয়াক্কুলের দোয়া করি?

যেহেতু মসজিদে বান্দা যতক্ষণ থাকে পুরাটাই মূল মাকসাদের কাজ; তাই মসজিদে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকাও ইবাদত। আমরা নামাযের অপেক্ষায় বসে আছি, এটাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হচ্ছে। কারো অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকাটাও ইবাদত। মূল মাকসাদে শামিল হওয়ার পর এখন আর তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয় না। তাই তো মসজিদে প্রবেশের সময় এই বলে দোয়া করা হয়,

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

“হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য রহমতের সব দরজা খুলে দিন।” এখন আমরা এমন জায়গায় চলে এসেছি, যেখানে শুধুই রহমত আর

রহমত। এখান থেকে আমরা যত বেশি রহমত নিতে পারব, ততই আমরা সৌভাগ্যবান হব। এ কারণে কারো দিল যদি সবসময় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে তার এত বেশি রহমত অর্জিত হবে যে, হাশরের কঠিন ময়দানে তার জন্য আরশের ছায়া নসীব হয়ে যাবে। [দেখুন, সহীহ বুখারী: ৬৬০; সহীহ মুসলিম: ১০৩১]

আরেকটি কথা বলি, আমাদের মধ্যে যে যত বেশি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে, সে দুনিয়ার জন্য তত বেশি উপকারী বলে সাব্যস্ত হবে। রহমত কেবল আল্লাহর তরফ থেকেই অর্জিত হয়। আর রহমত ব্যাপকতাকে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ("আর আমার রহমত সকল জিনিসকে বেষ্টন করে আছে।" -সূরা আরাফ ০৭: ১৫৬)

আল্লাহর রহমত এমনই যে, তা ছড়িয়ে পড়তে চায়। তাই যে যত বেশি আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে, তার দ্বারা দুনিয়াবাসী তত বেশি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত সবচেয়ে ব্যাপক। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ("আমি আপনাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।" -সূরা আম্বিয়া ২১: ১০৭)

বলছিলাম, বান্দা যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে তাওয়াক্কুলের দোয়া করে না। বরং সে রহমতের সব দরজা খুলে দেয়ার দোয়া করে। কেননা মসজিদে যখন সে প্রবেশ করলো তখন সে মূল মাকসাদে প্রবেশ করে ফেলেছে। তাই এখন তাওয়াক্কুলের দোয়া না; তাওয়াক্কুলের বিষয়টা আসবাবের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, যখন কেউ মসজিদ

থেকে বের হয়ে যাবে, তখন আবার তাওয়াক্কুলের দোয়া পড়ে নিতে পারে। এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় এসেছে-

عن مجاهد قال :كان يقال :إذا خرج الرجل من المسجد فليقل: بسم الله توكلت على الله اللهم أني أعوذ بك من شر ما خرجت إليه. —المصنف لابن أبي شيبة: **30441**

অর্থ: (বিখ্যাত তাবেঈ) হযরত মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাদের সময়ে এই শিক্ষা দেয়া হতো যে, যখন কেউ মসজিদ থেকে বের হবে সে যেন পড়ে নেয়, (بسم الله توكلت على الله اللهم أني أعوذ بك من شر ما خرجت إليه) অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমি যেদিকে যাচ্ছি সেখানকার মন্দ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"

কয়েকটি শিক্ষা

উপরের এ আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

০১. ঘর থেকে বের হওয়া এবং প্রবেশ করতে এখন থেকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো।

০২. যখন মসজিদের দিকে রওয়ানা হবো তখন দিলে হাজির করবো যে, আমি আমার জীবনের মূল মাকসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

০৩. যেহেতু মসজিদে রহমতের সব দরজা খুলে দেয়া হয়, তাই আমাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে জুড়তে হবে।

তাওয়াক্কুল অনেক বড় আমল। আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিবে এই তাওয়াক্কুল ইনশাআল্লাহ।

আমরা কীভাবে আমাদের নামাযকে সুন্দর করতে পারি, এর উপর ধারাবাহিক আলোচনা করছিলাম। শেষ দিকের পয়েন্টটি ছিল, মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা। এবার সর্বশেষ পয়েন্ট নিয়ে কিছু কথা বলে আলোচনা শেষ করছি।

লাগাতার চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায়ের অনুশীলন করুন

তিরমিযীর এক হাদীসে এসেছে-

«مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ». (رواه الترمذي: 241)

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতের সাথে তাকবীরে উলা সহকারে নামায আদায় করবে, তার জন্য দুটি মুক্তির পরোয়ানা লেখা হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং নিফাক থেকে মুক্তি।" -জামে তিরমিযী: ২৪১

এখন তো শাবান চলছে যদি আমরা এখন থেকে এ আমলটি শুরু করি, তাহলে রমযানসহ চল্লিশ দিন সহজেই হয়ে যাবে। এ আমলের হিম্মত আমাদের সকলের করা উচিত।

আমার কেমন যেন মনে হয়, নিজের ভেতরে নিফাক আছে কি নেই, তা যাচাই এর জন্য এটি একটি উত্তম প্রক্রিয়া হতে পারে। আমরা এর মাধ্যমে (কাউকে বলা ছাড়া) নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করে

দেখতে পারি। তাকবীরে উলার সঙ্গে টানা চল্লিশ দিন নামায পড়ার কাজটি খুব সহজ নয়। কেউ চাইলেই করতে পারবে বিষয়টি এমন না। মূলত নিফাক মুমিনের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ব্যাধির একটি। সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সবসময় নিজেদের মধ্যে নিফাক ঢুকে গেল কিনা, এ শঙ্কায় থাকতেন।

বিশেষ করে যারা জিহাদের পথে অবিচল থাকতে চায়, তাদের জন্য এই আমলের গুরুত্ব অনেক। কারণ এটা স্বীকৃত যে, নিফাক জিহাদের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

কমপক্ষে এই হিম্মত করা যে, এখন থেকে রমযানের শেষ পর্যন্ত কোনো নামাযে আমরা মাসবুক হবো না। সব সময় 'সাবেক' থাকবো। 'মাসবুক' অর্থ যে পিছনে পড়ে গেছে। আর 'সাবেক' অর্থ অগ্রগামী। যারা নামাযে 'সাবেক' (অগ্রগামী) থাকতে পারবে, আশা করা যায়, দ্বীনের অন্য সকল কাজে তারাই 'সাবেক' থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ। (والسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ) পক্ষান্তরে যারা নামাযে পিছিয়ে থাকবে, তারা জান্নাতে প্রবেশসহ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। হাদীসে এসেছে,

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. -صحيح مسلم (438)

"কিছু লোক সবসময় সামনের কাতার থেকে পেছনে থাকবে। আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখবেন।" -সহীহ মুসলিম: ৪৩৮

মূলত নামায এমনই একটি ইবাদত, এখানে যার হালাত যত বেশি ভালো হবে, বুঝতে হবে তার বাকি হালাতগুলো তত বেশি ভালো, তত বেশি উন্নত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। রমযানের আগেই আমাদের নামাযকে সুন্দর করে দিন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

তিলাওয়াত, সিয়াম, দোয়া ও ইহতিসাব

৪র্থ মজলিস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রস্তুতি হলো-

০৩. অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা

আমরা পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি, আসমান, জমিন, সাগর, নদী, পাহাড়, সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি-মাখলুক। শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে আছে, যা মাখলুক নয়। তা হলো, কুরআন, এটি আল্লাহর সিফাত। এর মধ্যে আল্লাহকে পাওয়া যাবে।

তাঁর ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই কুরআন।

রমযানে কুরআনুল কারীমের বেশি থেকে বেশি কদর করার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নিলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিয়ে দিবেন। একই কথা বারবার বলা হচ্ছে। আমরা এখন যদি কুরআনের কদর বাড়িয়ে দেই, আল্লাহ তাআলা সামনে এই নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দিবেন। এটাই তাঁর নীতি।

কুরআনকে আপন করতে আমরা তিনটি কাজ করতে পারি-

এক. কুরআনের জন্য অবসর হওয়া।

দুই. অবসর পেলেই কুরআন পড়া।

তিন. আসবাব (মূল মাকসাদ নয় এমন কাজগুলো) আদায়ের সময়গুলোতে তিলাওয়াত ও যিকির বাড়িয়ে দেয়া।

আমরা কুরআনকে আপন করতে চাই এটি কীভাবে প্রকাশ পাবে?

প্রকাশ পাওয়ার সুরত হলো, আমাদের নিয়মিত তিলাওয়াত আগের চেয়ে বাড়ার দ্বারা এটি সুস্পষ্ট হবে। আমরা কুরআনের জন্য আগের চেয়ে বেশি সময় বরাদ্দ করছি কিনা? কোথাও আসা-যাওয়ার পথে নিজেদের মুখস্থ সূরাগুলো তিলাওয়াত করব।

আমরা অনেকেই কুরআনের ছোট সূরাগুলোকে শুধু নামাযের সূরা মনে করি। যাদের শুধু এই সূরাগুলোই মুখস্থ, তারা কোথাও আসা-যাওয়ার পথে এগুলোই মুখস্থ তিলাওয়াত করব। পর্যায়ক্রমে নিজের

মুখস্থের পরিমাণ বাড়াব। রাতে তাহাজ্জুদে বেশি বেশি তিলাওয়াতের চেষ্টা করব। রাতের তিলাওয়াতের বিশেষ গুরুত্ব আছে, বিশেষত শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সময়ে।

এক হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان)) –مسند أحمد: 6626

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সিয়াম এবং কুরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, "হে রব! আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।" আর কুরআন বলবে, "আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।" ফলে উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।" [মুসনাদে আহমদ: ৬৬২৬]

আমরা হাশরের দিনের করুণ পরিস্থিতি চিন্তা করে তারপর এদের সুপারিশের বিষয়টি চিন্তা করে দেখব। তখন এদের কদর বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

পূর্ণ কুরআনের সুপারিশ

কিয়ামত দিবসে কুরআন সুপারিশকারী হবে:

عن أبي أُمامةَ رَضِيَ الله عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: اقرَءوا القُرآنَ؛ فإنَّه يَأتي يَومَ القيامةِ شَفيعًا لأصحابِه. —صحيح مسلم: 804

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কুরআন পড়। কেননা কুরআন তার ধারক-বাহকদের জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী হবে।" -সহীহ মুসলিম: ৮০৪

অপর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ»)) —المعجم الكبير: 10450

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরআন এমন সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে, এবং এমন সাক্ষ্যপ্রদানকারী, যার সাক্ষ্য সত্যায়িত হবে। (সুতরাং) যে এই কুরআনকে নিজের সামনে রাখবে, কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে কুরআনকে পিছনে ফেলে রাখবে, কুরআন তাকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" [মুজামে কাবীর: ১০৪৫০]

কুরআনের সূরাগুলোও সুপারিশ করবে

পূর্ণ কুরআন তো সুপারিশ করবেই, অন্য হাদীসে এসেছে, কুরআনের কিছু কিছু সূরাও তার তিলাওয়াতকারীর জন্য আলাদা ভাবে সুপারিশ করবে। কিয়ামতের কঠিন দিনে কুরআনের শক্তি হবে বর্ণনাতীত।

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: إن سورة من القرآن –ثلاثون اية– شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. —رواه الترمذي: 2891 وقال: هذا حديث حسن.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুরআনে ৩০ আয়াতের একটি সূরা রয়েছে; যা (তিলাওয়াতকারী) ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। আর তা হলো, তাবারাকা...(অর্থাৎ সূরা মুলক)।” [জামে তিরমিযী: ২৮৯১]

অপর এক হাদীসে এসেছে, শুধু কিয়ামতের দিন নয়, বরং কবরেও এই সূরা তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।

عن عبد الله بن مسعود– موقوفاً قال: ((من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة مَنَعه الله من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نسميها المانعة. —السنن الكبرى للنسائي: 10479

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এ সূরাকে ‘আল-মানিআহ’ (বারণকারী) নামে ডাকতাম।” [সুনানে কুবরা, নাসায়ী: ১০৪৭৯]

সূরা মুলকের আমল আমরা রাতের যেকোনো সময়ে করতে পারি। ঘুমের পূর্বে হতে হবে তা জরুরি না। উপরের হাদীসেও এটা স্পষ্টভাবে এসেছে।

যুদ্ধের আমীর নির্বাচনে সূরা বাকারার প্রভাব

অপর এক হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، فقال" :ما معك يا فلان؟" قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: "أمعك سورة البقرة؟" فقال: نعم، قال: "فاذهب فأنت أميرهم"... .)) . –رواه الترمذي: 2876 وقال: هذا حديث حسن.

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজনের একটি বাহিনী পাঠাতে গিয়ে কে কতটুকু কুরআন শিখেছে, জানতে চাইলেন। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে কুরআনের কতটুকু (ইলম) আছে? এভাবে এক এক করে অল্প বয়সের এক যুবকের কাছে এসে বললেন, “ওহে অমুক! তোমার কাছে কতটুকু (ইলম) আছে?” সে বলল, “আমার কাছে এই এই সূরা ও সূরা বাকারা (-এর ইলম) আছে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাছে সূরা বাকারা (-এর ইলম) আছে?” সে বলল, “হ্যাঁ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যাও তুমিই তাদের আমীর।” .... [সুনানে তিরমিযী: ২৮৭৬]

লক্ষ করুন, সূরা বাকারা যদি দুনিয়াতে লোকদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করতে পারে, তাহলে কিয়ামতে তার অবস্থা কী হবে?

সাহাবায়ে কেরামের ‘ইলমে কুরআন’ এত গভীর কেন?

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম ১০টি করে আয়াত হিফজ করতেন, তার উপর আমল করতেন, এরপর পরবর্তী আয়াতে যেতেন। [দেখুন, মুসনাদে আহমদ: ২৩৪৮২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ: ২৯৯২৯]

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কাজটা আমরা করি না। যদি আমরাও করতাম, আমাদের হালাত এবং কুরআনের বুঝ অনেক বেশি গভীর হতো। আমাদের এখন পড়া ও না পড়া সমান হয়ে গেছে। তাই পড়িই না।

আমরাও সংক্ষিপ্ত তাফসীর সামনে রেখে ১০টি করে আয়াত পড়তে পারি। আয়াতগুলোর উপর আমাদের আমল আছে কিনা যাচাই করতে পারি। এভাবে অগ্রসর হলে খুব দ্রুত কুরআন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

তাকওয়ার স্তরভেদে কুরআনের ইলম উদ্ভাসিত হয়

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখব....

প্রত্যেকের তাকওয়ার হালাত অনুযায়ী কুরআন তার ভেতরে থাকা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা ১০টি করে আয়াত পাঠ করব, মুখস্থ করব, আমলে আনব। এর দ্বারা আমাদের তাকওয়ার পর্যায় উন্নীত হবে। আমরা এভাবে অগ্রসর হতে থাকলে এক বছর পর যদি আমরা এই পড়া আয়াতগুলো আবার দেখি, দেখব আগের চেয়ে কুরআন তার আরও গভীর ভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মোচিত করছে।

এভাবে তাকওয়ার স্তরে যে যত উপরে উঠবে তার কাছে কুরআন আরও গভীরভাবে ধরা দিবে। এর কোনো শেষ নেই। আল্লাহর জাতকে আমরা যেমন মাথায় ধারণ করতে অক্ষম, তদ্রূপ তাঁর সিফাত (কালামুল্লাহ) এর গভীরতাও ধারণ করতে অক্ষম। এর গভীরতা আমরা কেউই খুঁজে পাব না। যে যত উপরে উঠবে তার কাছে একই আয়াতে অনেক অনেক কিছু ধরা দিবে।

সাহাবায়ে কেরাম কুরআনকে খুব গভীর থেকে উপলব্ধি করতেন। কারণ কুরআন তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। (هدًى للمتقين) এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। সুতরাং যার তাকওয়ার স্তর যত বাড়তে থাকবে, সে কুরআন থেকে ততবেশি দিকনির্দেশনা পেতে থাকবে।

ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমরা দেখব, নেতৃত্বের জন্য আমাদের সেসব ভাইরাই সামনের সারিরে চলে আসবেন, যারা সবচেয়ে বেশি কুরআন ওয়ালা হবেন। কুরআন যাদের জীবনে যতবেশি ছাপ ফেলতে পারবে তাঁদের মধ্য থেকেই আগামীর নেতৃত্ব তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের নেতৃত্বকে হেফাযতে রাখুন, তাঁদের জীবনে বরকত দান করুন।

মূলত কেউ কুরআন ওয়ালা না হয়ে আল্লাহর বাহিনীকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। কুরআন ওয়ালা না হয়ে কেউ আল্লাহর পক্ষে দরকষাকষি করতে পারবে না।

কুরআন অমূল্য কষ্টিপাথর

কুরআন এমন এক জিনিস যার সাথেই যুক্ত হয়েছে সেই জিনিস দামি হয়ে গেছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী হয়েছেন কুরআনের কারণে। তাঁর এতবড় শ্রেষ্ঠত্ব এই কুরআনের কারণেই।

রমযান মাস শ্রেষ্ঠ হয়েছে, এই কুরআনের কারণে।

শবে কদরের এত মর্যাদা, এই কুরআনের কারণে।

মক্কা মদীনা দামি হয়েছে, এই কুরআনের কারণে।

অতএব এমন কষ্টিপাথর থেকে দূরে থাকাটা আমাদের জন্য কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক বাড়িয়ে দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে প্রচুর পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। প্রতিদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে কুরআনুল কারীমের দাওর করতেন অর্থাৎ তিনি তিলাওয়াত করতেন, জিবরাঈল আমীন তাঁর তিলাওয়াত শুনতেন এবং জিবরাঈল আমীন তিলাওয়াত করতেন, তিনি তাঁর তিলাওয়াত শুনতেন। [দেখুন, সহীহ বুখারী: ৬]

সুতরাং কুরআনের সঙ্গে আমাদের যার যে স্তরের সম্পর্ক আছে, তা আরও সমৃদ্ধ, গভীর ও বোধসম্পন্ন করা জরুরি। যাদের তিলাওয়াতে দুর্বলতা আছে, তাদের করণীয় হলো, তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করা। যাদের অনুবাদ রপ্ত নেই, তাদের অনুবাদ রপ্ত করা উচিত। যাদের ব্যাখ্যা জানা নেই, তাদের গ্রহণযোগ্য কোনো সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ পড়া আবশ্যক। যাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পড়া হয়েছে, তাদের আরেকটু বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ পড়া প্রয়োজন। প্রতিটি আয়াত তাদাব্বুর তথা

অর্থ-মর্ম চিন্তা করে পড়া প্রয়োজন। কুরআনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল-অমিলের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে করে তিলাওয়াত করতে হবে। মোটকথা রমযান উপলক্ষে কুরআনের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যেন আমাদের জীবন-যাপন ও চলন-বলন সবকিছু হয়ে ওঠে কুরআনময়!

রমযানের প্রস্তুতির ৩টি পয়েন্ট গেল।
এক. তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।
দুই. নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করা।
তিন. কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে চতুর্থ প্রস্তুতি হলো-

০৪. এ মাসে (শাবানে) বেশি বেশি সিয়াম পালন করা

হযরত উসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমযান ছাড়া) শাবান মাসে যত রোযা রাখতেন অন্য কোনো মাসে এত রোযা রাখতেন না।"
উসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি (একবার) বললাম...

وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.

"আপনি শাবান মাসে যত রোযা রাখেন (রমযান ছাড়া অন্য) কোনো মাসে আপনাকে এত রোযা রাখতে দেখিনি"

উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. —سنن النسائي: 2357

"শাবান হলো রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হলো এমন মাস, যে মাসে রব্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক।" —সুনানে নাসায়ী: ২৩৫৭

সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রতিদিন বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে, আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। এটি হলো প্রতিদিনের আমলনামা। [দেখুন, সহীহ বুখারী: ৫৫৫; সহীহ মুসলিম: ১৭৯]

অপর এক সহীহ হাদীসে এসেছে, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়। এটি হলো সাপ্তাহিক আমলনামা। [দেখুন, সহীহ মুসলিম: ২৫৬৫]

আর একবার পেশ করা হয় বাৎসরিকভাবে। সেটা হলো শাবান মাসে। উপর্যুক্ত হাদীসে সেই কথাই বলা হয়েছে। [লাতায়েফুল মাআরেফ, ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ, পৃ: ১২৭ দারু ইবনি হাযম]

রমযানের আগে-পরের রোযাগুলোর গুরুত্ব

قال ابن رجب رحمه الله : وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده ، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض ،

وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده ، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه. -لطائف المعارف، ص: 129 ط. دار ابن حزم

ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নফল রোযার মধ্যে রমযানের আগে-পরের রোযাগুলো সর্বোত্তম। ফরয নামাযের আগে বা পরে যেমন সুন্নতে মোয়াক্কাদা থাকে; যা ফরযের ঘাটতি পূরণ করে, তদ্রূপ রমযানের আগের ও পরের রোযাগুলোও। সুতরাং নামাযের আগের ও পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলো যেমন অন্য যেকোনো নফল থেকে উত্তম, তদ্রূপ রমযানের আগের ও পরের রোযাগুলোও অন্য সব নফল রোযার চেয়ে উত্তম।" [লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ: ১২৯]

রমযানের রোযা যেমন হওয়া কাম্য তেমন অনুশীলন শাবানের রোযাগুলোতেই করা উচিত। অনর্থক কথা ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা উচিত। কাউকে কষ্ট না দেওয়া, পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা, সর্বোপরি রোযা অবস্থায় গোস্বা সংবরণ করা ইত্যাদি উচিত।

মসজিদে যেমন রহমতের সব দরজা খোলা থাকে, তদ্রূপ রমযান মাসেও রহমতের সব দরজা খোলা থাকে। সুতরাং রহমতের সব দরজা খোলা থাকা অবস্থায় মসজিদে যেমন হৈচৈ, গালিগালাজ, অনর্থক আলাপচারিতা, দুনিয়াবি বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয়, তদ্রূপ রমযানে রহমতের সব দরজা খোলা থাকা অবস্থায় এসব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয়। বিশেষ করে যখন বান্দা সিয়ামের মতো এত পছন্দনীয় ইবাদতে মশগুল থাকে, তখন এসব কাজে জড়িত হওয়া অনেক বেশি অপছন্দনীয়।

তাই আমাদের উচিত রমযানের আগেই নফল সিয়ামের মাধ্যমে এগুলোর অনুশীলন করা। আল্লাহ তাআলা যখন দেখবেন যে, বান্দা রমযান আসার আগেই রোযা রাখে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে, চেষ্টা করছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার জন্য, তখন তিনি অবশ্যই বান্দার এ চেষ্টার মূল্যায়ন করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক বাড়িয়ে দিন। আমীন।

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে পঞ্চম প্রস্তুতি হলো-

০৫. বেশি বেশি দোয়া করা ও তাওফীক কামনা করা

কোনো বিরাট কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার বিরাট তাওফীকের বিষয় থাকে। আর তাওফীক দোয়ার মাধ্যমে চেয়ে নিতে হয়।

দোয়ার মাধ্যমে দুটি জিনিস অর্জিত হয়।

এক. বান্দার গাফেল অন্তর সজাগ হয়। আমরা লাগাতার কিছু চাচ্ছি কিন্তু তার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করব না; এমনটি সাধারণত হয় না।

দুই. আল্লাহ তাআলার তাওফীক বেড়ে যায়; আর মূলত এ কারণেই বান্দার গাফলত দূর হতে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে, “দোয়াই হলো ইবাদত।” -জামে তিরমিযী: ২৯৬৯

সুতরাং আমরা যদি ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হই তাহলে দোয়ার মাধ্যমেই শুরু করা উচিত। তাহলে এই ইবাদতই অন্যান্য ইবাদতের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক...

কেউ যখন ভালো কাজ করে তখন এই ভালো কাজটি অপর ভালো কাজকে টেনে নিয়ে আসে। তদ্রুপ খারাপ কাজও অপর খারাপ কাজকে টেনে নিয়ে আসে। এ কারণে হাদীসে এসেছে, "কোনো গুনাহ হয়ে গেলে দ্রুত কোনো ভালো কাজ কর। তাহলে ভালো কাজটি ঐ খারাপ কাজকে মিটিয়ে দিবে।"-জামে তিরমিযী: **১৯৮৭**

নতুবা খারাপ কাজ অপর খারাপ কাজকে ডেকে নিয়ে আসবে। এগুলো চেইনের মতো।

মূলত ভালো কাজ করার অর্থ হলো, আমরা আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামতকে ভালো কাজে সম্পৃক্ত করব। ফলে তিনি নেয়ামত বাড়িয়ে দিবেন বিধায় আরেকটি ভালো কাজের তাওফীক তৈরি হবে। অপর দিকে খারাপ কাজ করলে যেহেতু আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের না শোকরি হয়, তাঁর দেয়া নেয়ামতগুলো দিয়েই তাঁর অবাধ্যতা করা হয়; তাই তাওফীক কমে যায় কিংবা থেমে যায়। তখন আরও খারাপ কাজ করতে মন আগ্রহী হয়ে ওঠে।

হযরত হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রতিটি ভালো বা মন্দ আমল করার পর সেই আমলটি বলতে থাকে أختي أختي.. অর্থাৎ বোন আমার! এসো, বোন আমার! এসো। অর্থাৎ ওই আমলটি তার মতো অন্য আমলকে ডাকতে থাকে।

অনেক সময় আমরা খাস কোনো একটি নেক কাজ করতে চাই। মনে করি, তাহাজ্জুদ পড়তে চাই। তাহলে আমাদেরকে প্রথমে হিম্মত করে একদিন শুরু করতে হবে। তখন প্রথম তাহাজ্জুদ আমাদের পরবর্তী তাহাজ্জুদের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু প্রথম তাহাজ্জুদটা শুরু করতে হলে আমাদেরকে হয়তো অন্য কোনো ভালো আমল করতে হবে.. যার ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাহাজ্জুদের তাওফীক দান করবেন। কিন্তু আমরা তো জানি না, কোনটার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই তাওফীক দিবেন। কিন্তু একটা উপায় আছে আমরা একটা ভালো কাজও করব এবং এর ফলে আমাদের তাহাজ্জুদের তাওফীক হয়ে যাবে যা আমরা বুঝতে পারব। আর তা হলো, দোয়া। আমরা দোয়ার মাধ্যমে সহজে কোনো নেক আমলের ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারি।

হাদীসে এসেছে, "দোয়া ইবাদতের সার।" অপর হাদীসে এসেছে, "দোয়াই ইবাদত।" -জামে তিরমিযী: ২৯৬৯; ৩৩৭১

সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে আমাদের উচিত ছোট-বড় বিভিন্ন ইবাদতের ভিত তৈরি করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে খাসভাবে তাওফীক চেয়ে নেওয়া।

মোটকথা, দোয়া হলো, ইবাদতের চেইন তৈরি করার জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম।

প্রতি ওয়াক্তে ফরয নামাযের পর দোয়া কবুল হয়। তখন দোয়া করব। আল্লাহ তাআলা যেন রমযানকে আমাদের সকলের জন্য অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দেন। রমযানকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিটি মুজাহিদ ভাইকে তাকওয়ার দৌলত দান করেন। নিজেদেরকে

একজন যোগ্য সদস্য হিসেবে প্রস্তুত করার তাওফীক দান করেন। সুতরাং আমরা রমযানের জন্য তাওফীকের ভিত এখনই দোয়ার মাধ্যমে তৈরি করব। প্রতিদিন হাত তুলে দোয়া করব। রমযানে নেকআমলের তাওফীক বৃদ্ধির জন্য দোয়া করব।

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে ষষ্ঠ প্রস্তুতি হলো-

০৬. ইহতিসাব। আল্লাহর কাছে আজর পাওয়ার আশা অন্তরে তৈরি করা

এর জন্য আমাদেরকে আমলের ফযীলত জানতে হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদাগুলো জানতে হবে। আর তাঁর প্রতি সুধারণা তৈরি করব।

রমযানে বিশেষ বিশেষ আমলের কথা ইহতিসাবের কথা হাদীসে এসেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "–صحيح البخاري: 38 صحيح مسلم: 760

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (অর্থাৎ সাওয়াবের আশা নিয়ে) রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ৩৮; সহীহ মুসলিম: ৭৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "–صحيح البخاري: 37 صحيح مسلم: 759

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (সাওয়াবের আশা নিয়ে) রমযানের কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ৩৭; সহীহ মুসলিম: ৭৫৯]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "- صحيح البخاري: 1901

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (সাওয়াবের আশা নিয়ে) লাইলাতুল কদরে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ১৯০১]

এখানে লক্ষ করি...

আমরা যদি ইহতিসাব আগে থেকে না শিখি, তাহলে রমযানে ইহতিসাব কীভাবে করবো? সাধারণত দেখা যায় আমরা রমযান আসার পর ইহতিসাবের হাদীস শুনি ও পড়ি এবং ইহতিসাবের বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি। অথচ যদি রমযান আসার আগেই বুঝা হতো, তাহলে রমযানে ইহতিসাব সহজ হতো। তখন দেখা যেত, আমাদের প্রতিটি ইবাদত ইহতিসাবের সাথেই হচ্ছে। নয়তো দেখা যায় ইহতিসাব বুঝতে বুঝতে রমযানের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়।

ইহতিসাব হলো, সাওয়াবের আশা নিয়ে আমল করা। অর্থাৎ মনে অনুভূতি জাগ্রত থাকা। এমন নয় যে, সবাই করছে, তাই আমরাও করছি।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যেখানেই ইবাদত অত্যন্ত উঁচু মানের হয়, আর মানুষের মধ্যে সবাই করছে তাই আমরাও করছি... এমন প্রবণতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেই ইসলাম ইহতিসাবের দিকে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" [দেখুন, ফয়যুল বারী: ১/২০০, ২০১, ২১৮ দারুল কুতুব]

রমযানের আমলগুলোতে এই জিনিসটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক থাকে। সবাই রোযা রাখছে, তাই দেখাদেখি আমরাও রাখছি, আমাদের মনে সাওয়াব প্রাপ্তির আশা জাগ্রত থাকলো না। তেমনিভাবে সবাই তারাবীহ পড়ছে, তাই আমরাও পড়ছি। সবাই শবে কদর পালন করছে, তাই আমরাও করছি।

আল্লাহ তাআলা বান্দার অনুভূতি জাগ্রত থাকাকে পছন্দ করেন। তাই হাদীসে রমযানের বিশেষ তিনটি আমলের ক্ষেত্রে ইহতিসাব থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দাকে শিখানো হচ্ছে যে, এই ইবাদতগুলো আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন তাই আমরা করছি। এমন নয় যে, সবাই করছে তাই আমরাও করছি।

আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন আমাদের মাকসাদ। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবাদত করব আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে।

ইবাদত কোনো আবেগে পড়ে করা হবে না...

ইবাদত সবাই করে তাই আমরাও করি এমনভাবে হবে না...

ইবাদত করা হবে... আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে। এ কারণেই তাঁর হুকুমটার প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

দেখব, অনেকে জিহাদের আমলে যুক্ত হয় আবেগের কারণে। তাদের আবেগে একটু ভাটা তৈরি হলে, আমল ছুটে যায়। কিন্তু যদি তারা

আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে আমলে সম্পৃক্ত হত এবং সাওয়াব প্রাপ্তির আশা নিয়ে যুক্ত হত, তাহলে সবাই ছেড়ে দিলেও এরা ছাড়তো না।

যখন জয়জয়কার অবস্থা থাকে তখন মুনাফিকরাও জিহাদে শামিল হয়। যেহেতু মুনাফিকরা আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে জিহাদে আসে না, তাই কঠিন সময়ে তাদের জিহাদ ছুটে যায়। তিনি আমাদের হেফাযত করুন।

আল্লাহ তাআলার হুকুমটা যেহেতু মূল তাই সেহরী একদম শেষ সময়ে আর ইফতার একদম শুরুর সময়ে করে ফেলা সুন্নত। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার হুকুম তথা নির্দেশ পালনের বিষয়টি বেশি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। মূলত সওমের নির্দেশ যখন থেকে শুরু এবং যখন শেষ এটা মাথায় জাগ্রত রেখে ইবাদত করাটা তিনি চান। ধরি আমরা সেহরী খেয়ে ফেললাম, রাত একটায়। এক্ষেত্রে আমাদের সিয়াম তো হয়ে যাবে। কিন্তু সিয়াম যখন থেকে শুরু এর আগে থেকেই শুরু করে ফেলার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরিমাণটা কম প্রকাশিত হয়। অনুরূপ ইফতারের ক্ষেত্রেও।

মোটকথা, আমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করছি... এটি ইবাদতের মাধ্যমে ফুটে উঠা কাম্য।

এর সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অনেক সময় কোনো দারসে দোয়া করা হলে বেশিরভাগ ভাই দোয়াটি পড়ে তারপর আমীন লিখেন। আর কিছু ভাই থাকেন যারা অন্য ভাইদের আমীন লিখতে দেখে আমীন লিখে দেন। এরূপ ভাইদের লেখা এই 'আমীন'টি হলো ইহতিসাব ছাড়া।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে ইহতিসাব দান করুন। প্রতিটি ইবাদতকে তাঁর হুকুম জেনে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

والحمد لله رب العالمين.

নিজ অনিষ্ট থেকে সবাইকে রক্ষা করুন এবং ক্রোধ দমন করুন

৫ম মজলিস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

ইতিপূর্বে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতির ছয়টি পয়েন্ট অতিবাহিত হয়েছে-

এক. তাওবা করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসা।

দুই. নামাযকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করা।

তিন. কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
চার. শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা।
পাঁচ. বেশি বেশি দোয়া করা এবং তাওফীক কামনা করা।
ছয়. ইহতিসাব। অন্তরে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশা পোষণ করা।
রমযানের পূর্বে আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে সপ্তম প্রস্তুতি হলো-

০৭. নিজের সকল মন্দ আচরণ থেকে অপর মুসলিমকে হেফাযতে রাখার সংকল্প করা

রমযান শুরু হওয়ার আগেই এর অনুশীলন করব। তাহলে রমযানকে আঁচড় মুক্ত রাখা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।
প্রথমেই বলা হয়েছে, রমযানে মুবাহ বিষয়গুলোকে (পানহার ইত্যাদি) নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে খুবই শক্তিশালী একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মূলত প্রশিক্ষণ সবসময় বাস্তব যুদ্ধের চেয়ে কঠিনই হয়ে থাকে। যেন বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করা সহজ হয়।
তাকওয়ার এই কঠিন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, বান্দা যেন এর মাধ্যমে যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর বিধান পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। কোনো ধরনের বেগ পেতে না হয়। কিন্তু এখন যদি কেউ তাকওয়ার তৃতীয় স্তরের প্রশিক্ষণে এসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরকে ভাঙ্গতে শুরু করে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে তার প্রশিক্ষণ ব্যর্থ। সুতরাং যে ব্যক্তি মুবাহ জিনিস পরিত্যাগ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

করতে এসে হারামে লিপ্ত হয়ে যায়, তার প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে।

এ কারণেই হাদীসে এসেছে-

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (رواه البخاري: 1903).

“যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলা এবং এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে পারলো না, এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার দ্বারা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।” [সহীহ বুখারী: ১৯০৩]

এসব বলা অনেক সহজ। কিন্তু আমলে পরিণত করা অনেক কঠিন। তাই আগে থেকেই শুরু করতে হবে। আমাদের দ্বারা কোনো মুসলমানের সম্মানহানী হয় কিংবা কষ্ট হয়, এমন সকল কাজ এখন থেকেই পরিহার করব।

রোযায় দেহের পাশাপাশি দিলেরও পরিবর্তন হতে হবে

রোযার মাধ্যমে পেট খালি থাকে, দেহ দুর্বল হয়, চেহারা শুকিয়ে যায়... কিছু পরিবর্তন আমাদের দেহে হয়। কিন্তু এগুলো করে যদি আমরা আমাদের দিলে কোনো পরিবর্তন না আনতে পারি, যদি এতে আমাদের অন্তর বিগলিত না হয়, আমাদের তাকওয়া, ঈমান, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া, দ্বীনের প্রতি দরদ, মুমিনদের প্রতি সহমর্মিতা, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে এই কষ্ট করে কী লাভ?

হাদীসে এসেছে-

«رُبَّ قَائِمٍ حَظّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ وَالعَطَشُ». -رواه ابن ماجه: 1690 وابن خزيمة: 1997 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 69) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অনেক রাত্রিজাগরণকারী আছে যার ভাগে রাত্রি জাগা ছাড়া আর কিছুই নেই এবং অনেক রোযাদার আছে যার ভাগে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া কিছুই নেই।”-সুনানে ইবনে মাজাহ: **১৬৯০; সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৯৯৭**

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (رواه البخاري: 1904).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি রোযা রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হৈচৈ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা মারামারি করতে চায়, সে যেন বলে, “আমি রোযাদার।” -সহীহ বুখারী: **১৯০৪**

“আমি রোযাদার”- এ কথাটির চর্চা বৃদ্ধি করব

“আমি রোযাদার, তাই তোমার কথার কোনো প্রতিউত্তর দিবো না।” ঘরের বাচ্চাদের মধ্যেও এ কথাটি চালু করার চেষ্টা করব। বাচ্চারা ঝগড়া করছে, তাদেরকে শিখিয়ে দিন, তারা যেন একে অপরকে এটা বলে। আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে বলব, তোমার কটু কথার উত্তর

আমি দিবো না, কারণ আমি রোযাদার। এমনভাবে চালু করব, যাতে আমাদের স্ত্রীরাও আমাদেরকে এটা বলতে পারে। এভাবে দেখা যাবে, একটা আবহ তৈরি হবে। মনে রাখবেন, যেহেতু কথাটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন, তাই হুবহু এ কথাটি বলার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ থাকবে। রোযা অবস্থায় যেকোনো বিবাদের মাঝে এ কথাটি পানি ঢেলে দেয়ার মতো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

রোযার হেফাযত করুন

عن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر – رضي الله عنه –: «إذا صُمْتَ فتحفَّظْ ما استطعْتَ». —المصنف لابن أبي شيبة: 8970

হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তুমি যখন রোযা রাখ, তখন যথাসম্ভব নিজেকে হেফাযতে রাখ।" -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৮৯৭০

عن مجاهد قال: «من أحب أن يسلم له صومه؛ فليتجنب الغيبة والكذب». —الزهد لهناد بن السري: 572/2 ط. دار الخلفاء

হযরত মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি চায়, তার রোযা নিরাপদ থাকুক, সে যেন গীবত ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকে।" -আয-যুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী: ২/৫৭২

সবচেয়ে সহজ রোযা

وعن ميمون بن مهران: «إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب». —المصنف لابن أبي شيبة: 8976

হযরত মাইমুন বিন মিহরান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সবচেয়ে সহজ রোযা হলো, পানাহার পরিত্যাগ করা।" -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৮৯৭৬

সবচেয়ে কঠিন রোযা

সবচেয়ে কঠিন রোযা হলো, তাকওয়ার সকল স্তর ঠিক রেখে রোযা রাখা। ঈমানে আঘাত আসে এমন আচরণ না করা এবং সকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা- এগুলো ঠিক রেখে তাকওয়ার তৃতীয় স্তর তথা পানাহার ও স্ত্রীর সঙ্গে নির্জন সাক্ষাত থেকে বিরত থাকা।

রমযানের পূর্বে আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে অষ্টম প্রস্তুতি হলো-

০৮. গোস্বা সংবরণ, অপরকে ক্ষমা করা এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলার অনুশীলন

ক্রোধ দমন করা এবং অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া। এটা আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সিফাত বলে বর্ণনা করেছেন।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
–آل عمران: 133، 134

মুত্তাকীদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি গুণ হলো, গোস্বা হজম করা এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া। [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৪]

এই দুইটা সিফাত যদি আমরা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে পারি তাহলে আশা করা যায়, আমাদের রমযান অতি সুন্দর হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের স্বার্থে কারো উপর গোস্বা হননি। এটা বলা সহজ, কিন্তু আমল করা অত্যন্ত কঠিন।

যে যত বেশি স্বার্থের জাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়, তার গোস্বাও তত বেশি আসে। আর যে নিজের স্বার্থগুলোকে যত ছোট ও সীমিত করে ফেলতে পারে, তার স্বার্থে মানুষের পাও তত কম পড়ে। আঘাতও কম লাগে। ফলে তার গোস্বা আসার সুযোগও কম হয়। আমাদের মধ্যে যে যত বেশি অন্যের স্বার্থে কাজ করতে পারবে, তার স্বার্থের জাল দিন দিন তত বেশি সংকুচিত হতে থাকবে।

গোস্বা সংবরণের অনুশীলন ঘর থেকে শুরু করব

আমরা একদিনেই প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠতে পারব না। আমাদেরকে ধাপে ধাপে উঠতে হবে। সবার আগে আমরা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করব। আগে বাচ্চাদের উপর কিংবা স্ত্রীর

উপর যতটুকুতে রেগে যেতাম, ধীরে ধীরে তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করব। সুন্দরভাবে তাদের ভুলের ইসলাহ করার চেষ্টা করব। একটু খেয়াল করলে দেখব, তাদের অনেক ভুল আছে এমন যে, তার মূল আমরাই। ঘরের যোগ্য কর্তা হওয়া সহজ কোনো বিষয় নয়। নিজেরা সব কাজে অলসেমি করি, আর স্ত্রীর কাছে আশা করি, সে তড়িৎ সব কাজ সেরে ফেলবে।

যে যত যোগ্য কর্তা হবে, তাকে তত বেশি সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হয়। পুরো সৃষ্টিকুলের কর্তা হলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাঁর অবস্থা দেখুন, তিনি কখনো ঘুমান না। তাঁর কখনও তন্দ্রা পর্যন্ত আসে না। মূলত যে যত বড় কর্তা হবে, তার সজাগ ভাব ও সতর্কতা ততবেশি হতে হবে।

অনেক সময় আমরা আমাদেরই অলসতার প্রভাব আমাদের সন্তান ও স্ত্রীর মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু পরে আবার রাগ ঝাড়ি তাদেরই উপর। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ। পরিবারের সবার ইসলাহের সূচনা হবে আমার নিজের ইসলাহ দিয়েই।

দ্বীনদারি সবার শেষে ঘরে আসে

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْمَلُ المؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. رواه الترمذي: 1162 وقال: حديث حسن صحيح.

"মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বাধিক পূর্ণ ওই ব্যক্তি যার আখলাক সবচেয়ে বেশি সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ।" -জামে তিরমিযী: **১১৬২**

এটা একটা বিরাট বড় ঘোষণা। মানুষের দ্বীনদারি সর্বশেষ পর্যায়ে আসে তার ঘরে। তাই কেউ যদি ঘরে দ্বীনদার হয়ে যেতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকব যে, সে বাইরেও দ্বীনদার হবে।

মানুষের একটা স্বাভাবিক চরিত্র হলো, যে জিনিসটা বেশি দৃশ্যমান তাকে সে আগে পরিচ্ছন্ন করে। ধরুন, হঠাৎ ঘরে মেহমান এলো। ঘর অগোছালো। সবাই তখন কী করে? আগে ড্রইংরুমটা দ্রুত পরিষ্কার করে। যত দ্রুত পারে। কারো ড্রইংরুম পরিষ্কার থাকার অর্থ এই না যে, তার ভেতরবাড়িও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু দেখব, যে ঘরের ভেতরবাড়ি সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকে, সে ঘরের ড্রইংরুমও পরিচ্ছন্ন থাকে।

এভাবে মানুষের দ্বীনদারিটাও বেশিরভাগ ঘরের বাইরে আগে থাকে। ঘরের ভেতরে পরে আসে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِي، وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِي صَالِحَةً. –رواه الترمذي: 3586

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরের অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম করে দিন এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাও ঠিক করে দিন।" -জামে তিরমিযী: ৩৫৮৬

এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরের চেয়ে ভেতরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ ভেতরটা ভালো হলে তার প্রভাব বাইরে পড়বেই।

এ রমযানে আমরা সবাই নিজ নিজ স্ত্রীর কাছ থেকে একটি ‘চারিত্রিক সনদ’ নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা সব সময় স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। বিশেষত রমযানে অন্য কাজের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে হলেও তাদেরকে একটু সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ইফতারি ও সাহরির জন্য অনেক কিছু আয়োজন করা থেকে বিরত থাকব। যেন তারাও অতিরিক্ত কিছু আমল করার জন্য সময় পায়। যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে, তারা স্ত্রীর তারাবীর জন্য বাচ্চাকে একটু সময় দিব। এটাও আমাদের জন্য অনেক বড় নেক আমল বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

‘গোস্বা সংবরণ’ রোযার পূর্ণতার অন্যতম উপাদান

রোযায় দিনব্যাপী পানাহার ইত্যাদি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আমরা নিজের শাহওয়াতকে দমন করার অনুশীলন করে থাকি। দিনের শেষভাগে এসে আমাদের পেট যত খালি হতে থাকে, শাহওয়াতের পরিমাণ তত হ্রাস পায়।

আমরা এই শাহওয়াতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি মূলত ইবাদতের দিকে আমাদের মনকে ধাবিত করার জন্য। কিন্তু দিনের শেষভাগে এসে যখন আমাদের পেট একদম খালি হয়ে যায়, তখন আমাদের মাঝে অপর একটি অনিষ্ট জন্ম নেয়ার শঙ্কা তৈরি হয়। তা হলো, গোস্বা।

এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। যখন পেটে ক্ষুধা থাকে তখন প্রতিটি জীবই অস্থির হয়ে যায়। বনের পশুপাখিরা পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে অনেক সময় লোকালয়ে চলে আসে।

ঘরের ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখি যে, যখন তাদের ক্ষুধা লাগে, তারা অস্থির হয়ে যায়। কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যায়, কাঁদতে থাকে।

বড়দের মধ্যেও ক্ষুধার প্রভাব পড়ে থাকে। তাদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ে; বাচ্চাদের মতো অকারণে না রাগলেও ছোট ছোট কারণে রেগে যায়।

তাই বলা চলে যে, রোযায় দিনের শেষভাগে তাকওয়ার অন্যতম সিফাত 'গোস্বা সংবরণ' এর অনুশীলন শুরু হয়।

মোটকথা, মানুষ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পেছনে দুটি বড় কারণ সক্রিয় থাকে। এক. শাহাওয়াত। দুই. গোস্বা। বিষয়টি ইমাম বায়যাবী রহিমাহুল্লাহও উল্লেখ করেছেন-

وقال البَيضاويُّ: ... أنَّ جَميعَ المفاسِدِ التي تَعرِضُ للإنسانِ إنَّما هي مِن شَهوتِه ومِن غَضَبِه – مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3187 ط. دار الفكر)

মানুষের মাঝে যত সমস্যা তৈরি হয় এর পিছনে ক্রিয়াশীল মূল কারণ দুটি হয়ে থাকে। এক. শাহওয়াত তথা মন যা চায় তা করার প্রবণতা। দুই. গোস্বা। -মিরকাতুল মাফাতীহ: ৮/৩১৮৭ (দারুল ফিকর)

সুতরাং বলা যায়, শুধু শাহওয়াতকে দমন করার দ্বারাই রোযার মাহাত্ম্য অর্জিত হবে না, বরং শাহওয়াত দমনের পাশাপাশি গোস্বা সংবরণের প্রয়োজন রয়েছে। উভয় গুণের সম্মিলিত অনুশীলনের দ্বারা রোযার পূর্ণতা অর্জিত হবে।

মূলত আমাদের ইবাদত তখনই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে, যখন আমরা নফসের অনিষ্ট থেকে নিজে বেঁচে থাকতে পারি এবং অপরকেও নিজের অনিষ্ট থেকে যখন বাঁচাতে পারি। সুতরাং রোযার মাধ্যমে যখন কোনো ব্যক্তির শাহওয়াত দমিত হয়, তখন সে নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। আর যখন সে গোস্বা সংবরণ করে, তখন অন্যরা তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এভাবে আমাদের ইবাদতগুলো হয় দামি। কারণ ইবাদতগুলোকে নষ্ট করার মতো উপাদান এখন আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে।

এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে-

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (رواه البخاري: 1904).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে রোযা রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হৈচৈ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা মারামারি করতে চায়, সে যেন বলে, "আমি রোযাদার।" -সহীহ বুখারী: **১৯০৪**

হাদীসে রোযাকে ঢাল বলা হয়েছে। অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে আমরা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হই। কারণ রোযার মাধ্যমে আমরা আমাদের শাহওয়াতকে দমন করার চেষ্টা করে থাকি। আর যারা শাহওয়াত দমন করতে পারলে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত; এটা কুরআনে এসেছে-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.- (سورة النازعات: 41-40)

আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং নফসকে খাহেশাত থেকে বাধা দেয়, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। - [সূরা নাযিআত, ৭৯:৪০-৪১]

কিন্তু এই ঢাল তখনই ঢালের ন্যায় কাজ করবে, যখন আমরা অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচানোর পাশাপাশি অন্যদেরকেও বাঁচানোর জন্য প্রয়াসী হবো। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তি যেন রোযা রেখে অশ্লীল কথা না বলে, হৈচৈ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা মারামারি করতে চায়, সে যেন বলে, "আমি রোযাদার।

গোস্বা বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ

মুত্তাকীদের একটি বড় সিফাত হলো, তারা রাগ তথা গোস্বাকে সংবরণ করে। মূলত অসংখ্য গুনাহের মূল হলো গোস্বা। তাই এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা জরুরি মনে হচ্ছে;

এ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আগে বুঝে নিই

(الغضب) গজব যেকোনো রাগ বা গোস্বাকে বলে।এটি একটি ব্যাপক শব্দ। কারো মন্দ বা অসমীচীন আচরণে রাগ হওয়াকে গজব বলে। এই গোস্বা কথা বা কাজ দ্বারা প্রকাশও পেতে পারে; যেমন- রাগের কারণে বকাঝকা করা বা গালিগালাজ করা। কিংবা রাগের কারণে শাস্তি দেওয়া অথবা মারধর করা। আবার প্রকাশ নাও পেতে পারে। উভয় অবস্থায় এটাকে গজব বলা যাবে। গজব-সাধারণ রাগ বড়রা যেমন ছোটদের প্রতি করতে পারে, ছোটরাও বড়দের প্রতি করতে পারে।

ছোট বাচ্চা গোস্বা করে বাবাকে মারে, আবার বাবা গোস্বা করে তার সন্তানকে মারে। উভয় ক্ষেত্রেই এটাকে গজব বলা যাবে।

(السخط) আর 'সাখাত' অর্থও গোস্বা। কিন্তু এটা শুধু বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বান্দার প্রতি কিংবা বাবা সন্তানের প্রতি গোস্বাকে 'সাখাত' বলা যাবে।

(الغيظ) কারো প্রতি গোস্বা করার পর যতক্ষণ তা কথা বা কাজ দিয়ে প্রকাশ না পাবে, ততক্ষণ তা গাইজ। আর এটাকে ভেতরে গিলে ফেলা তথা সংবরণ করে ফেলার নামই হলো (كظم الغيظ) কাজমুল গাইজ। এটি মস্তবড় ইবাদত। এটি মুহসীনদের বৈশিষ্ট্য।

যদি কারোর প্রতি গোস্বা করার পর প্রতিশোধ নেয়ার সক্ষমতা সত্ত্বেও গোস্বাকে সংবরণ করে নেওয়া হয়, তাকে কাজমুল গাইজ বলে। মন থেকে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিক বা না দিক, উভয় অবস্থায়ই এটা উন্নত গুণ। এটা যে কেউ করতে পারে না। তাই এর পুরস্কারও অনেক বড়। নগদ কিছু পুরস্কার যেমন-

০১. তার মধ্যে মুত্তাকীদের একটি সিফাত অর্জিত হয়।

০২. এমন ব্যক্তি ইহসান ওয়ালা।

০৩. এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

এই তিনটা বিষয়ই কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

–آل عمران: 133، 134

"আর নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীতুল্য। তা

মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা ঐসব লোক, যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা নিজেদের ক্রোধ হজম করতে এবং মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আর আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৪]

এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الحُورِ شَاءَ.-رواه الترمذي: 2021 وقال: هذا حديث حسن.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের গোস্বা প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে; আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকবেন এবং তাকে তার ইচ্ছামত যেকোনো হুর নির্বাচন করে নেওয়ার সুযোগ দিবেন।" [জামে তিরমিযী: ২০২১]

(العفو) কাজমুল গাইজের পর যদি আবার ওই ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দেয়া হয়, যাতে সে আল্লাহর কাছে আটকে না যায়, তাহলে এর নাম আফব (العفو)। এটি আরও বড় ইবাদত। এটি কাজমুল গাইজের চেয়েও আরও উঁচু স্তর। এটিও মুহসীনদের বৈশিষ্ট্য।

গোস্বা সংক্রান্ত একটি হাদীস

মুয়াত্তা মালিকের এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ، وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَغْضَبْ» -المؤطا: 905/2 ط. دار إحياء التراث، وأخرج البخاري نحوه: 6116 من حديث أبي هريرة.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা নিয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়ে দিব। বেশি কিছু দরকার নেই, নয়তো ভুলে যাব।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (لا تَغضَبْ) "তুমি গোস্বা করিও না।" -মুয়াত্তা মালেক: ২/৯০৫ আরো দেখুন, সহীহ বুখারী: ৬১১৬

একটু লক্ষ করি, কেউ মন্দ আচরণ করলে গোস্বা এসে যাওয়াটা সাধারণত একটি গায়রে ইখতিয়ারি বিষয়। আমাদের ইচ্ছার বাইরেই গোস্বা এসে যায়। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন, (لا تَغضَبْ) "তুমি গোস্বা করিও না"- এ কথার কী উদ্দেশ্য হতে পারে? গোস্বা তো করতে হয় না, এমনিতেই এসে যায়।

ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

(لا تَغضَبْ) কথাটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. অর্থাৎ তুমি উত্তম আখলাকের দ্বারা এমনভাবে সমৃদ্ধ হও যে, মানুষ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করার সুযোগই তৈরি না হয়। অর্থাৎ মানুষের সামনে তাওয়াজুর সাথে থাক, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে থাক, বদান্যতার সাথে থাক, নম্র আচরণ কর। কিংবা এমন উত্তম আখলাকের অধিকারী হও যে, কেউ মন্দ আচরণ করলেও তোমার মধ্যে গোস্বা তৈরি না হয়। অর্থাৎ ধৈর্য, সহ্য ক্ষমতা, পাশ কাটিয়ে

যাওয়া, গোস্বা সংবরণ করা, ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি গুণের অধিকারী হও।

দুই. (لا تَغضَبْ) এর অর্থ হলো, গোস্বার কারণে যা করতে মন চাচ্ছে সেটা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাক। -জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/৪০৪ (দারুস সালাম)

وقال البَيضاويُّ: لعلَّه لما رَأى أنَّ جَميعَ المفاسِدِ التي تَعرِضُ للإنسانِ إنَّما هي مِن شَهوتِه ومِن غَضَبِه، وكانت شَهوةُ السَّائِلِ مَكسورةً، فلمَّا سَأل عَمَّا يحتَرِزُ به عن القَبائِحِ نَهاه عن الغَضَبِ الذي هو أعظَمُ ضَرَرًا مِن غَيرِه، وأنَّه إذا مَلك نَفسَه عِندَ حُصولِه كان قد قَهرَ أقوى أعدائِه. – مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3187 ط. دار الفكر)

ইমাম বায়যাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

মানুষের মাঝে যত সমস্যা তৈরি হয় এর পিছনে মূল কারণ দুটি। এক. শাহওয়াত তথা মন যা চায় তা করা। দুই. গোস্বা। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির মাঝে লক্ষ করেছেন যে, তার শাহওয়াতের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত। তাই তিনি ঐ সাহাবীকে দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। অর্থাৎ কেউ যদি গোস্বা না করে থাকতে পারে, তাহলে তার দ্বারা ফাসাদ তৈরি হওয়ার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। -মেরকাতুল মাফাতীহ: ৮/৩১৮৭ (দারুল ফিকর)

এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «**لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ**».–صحيح البخاري: 6114 صحيح مسلم: 2609

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুস্তিতে প্রচুর ধরাশায়ী করতে পারে এমন ব্যক্তি মূলত শক্তিশালী নয়, বরং প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে গোস্বার সময় নিজের নফসকে কাবু (ধরাশায়ী) করতে পারে।” [সহীহ বুখারী: ৬১১৪; সহীহ মুসলিম: ২৬০৯]

গোস্বার ব্যাপার সালাফদের কিছু উক্তি

قال أبو الدَّرداءِ: أقرَبُ ما يكونُ العَبدُ مِن غَضَبِ اللهِ إذا غَضِبَ. —البيان والتبيين للجاحظ: 136/2 ط. دار الهلال،

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “বান্দা আল্লাহর গোস্বার সবচেয়ে কাছাকাছি তখন থাকে যখন সে নিজে গোস্বায় পতিত হয়।” -আল-বয়ান, জাহেয: ২/১৩৬ (দারুল হেলাল)

كان عمر بن الخطاب إذا خطب الناس يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من الهوى والطمع والغضب. —الزهد لأبي داود: 48

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুতবায় বলতেন, “যে ব্যক্তি হাওয়া (মন যা চায় তা করা), লোভ এবং গোস্বা থেকে বেঁচে থাকতে পারলো, সে সফলকাম।” -আয-যুহদ, আবু দাউদ: ৪৮

وقيل لابنِ المبارَكِ : اجمَعْ لنا حُسنَ الخُلُقِ في كَلِمةٍ، قال: تَرْكُ الغَضَبِ. —جامع العلوم والحكم: 403/1 ط. دار السلام

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহিমাহুল্লাহকে বলা হলো, আপনি ‘উত্তম আখলাক’ কে এক শব্দে বিশ্লেষণ করুন। তখন তিনি বললেন, “গোস্বা পরিত্যাগ করা।” -জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/৪০৩ (দারুস সালাম)

وقال بَكرُ بنُ عَبدِ اللهِ المزَنِيُّ: (لا يكونُ الرَّجُلُ تَقيًّا حتَّى يكونَ نَقيَّ الطَّمَعِ، نَقيَّ الغَضَبِ) .
—القناعة لابن أبي الدنيا، ص: 76 ط. مؤسسة الكتب

হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুত্তাকী হবে না, যতক্ষণ না সে লোভ ও গোস্বা থেকে পবিত্র হয়।" -আল-কানাআহ, ইবনু আবিদ দুনয়া, পৃ: ৭৬ (মুআসসাসাতুল কুতুব)

ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أحضَرُ النَّاسِ جَوابًا مَن لم يغضَب. —روضة العقلاء، ص: 138 ط. دار الكتب العلمية

"মজলিসে উপস্থিত উত্তর সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি দিতে পারে, যে গোস্বা করেনি।" -রওযাতুল উকালা, ইবনে হিব্বান, পৃ: ১৩৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

عن ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :ما مِن جُرعةٍ أعظَمُ أجرًا عندَ اللهِ مِن جَرعةِ غَيظٍ كَظمَها عَبدٌ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ. —سنن ابن ماجه: 4189

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঢোক গিলা সেটাই, যেটা বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গোস্বাকে গিলে থাকে।" -সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৯

قال الأحنَفُ: مَن لم يصبِرْ على كَلِمةٍ سَمِعَ كَلِماتٍ، وقال: رُبَّ غَيظٍ تجَرَّعتُه مَخافةَ ما هو أشَدُّ منه. —البيان والتبيين للجاحظ: 2/50، 51

হযরত আহনাফ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি একটি কথার উপর ধৈর্য ধরতে পারে না, তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। তিনি বলেন,

আমি অনেক গোস্বাকে (ঢোকের মতো) গিলে ফেলেছি, এরচেয়ে কঠিন বিষয় গিলতে হবে এই ভয়ে।” -আল-বয়ান, জাহেয: ২/৫০, ৫১

এই ঢোকের মতো গিলে ফেলার প্রশিক্ষণ আমরা নিতে পারব কি? আমরা অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের চেষ্টা বৃথা করবেন না। এর অনুশীলন আমরা আমাদের ঘর থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ।

মানুষের জাহালাতপূর্ণ আচরণকে এড়িয়ে চলব

মানুষকে তার স্ব স্ব স্থানে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বরাতে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন, “আমরা যেন মানুষকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানে রাখি।”-[মুকাদ্দামাতু সহীহি মুসলিম]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আমরা কাউকে তার অবস্থানের চেয়ে বড় অবস্থান দিলে মূলত ওই ব্যক্তিকে ফিতনায় ফেলা হবে। প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান দিতে হবে। আর তার অবস্থান অনুযায়ী তাকে সম্মান করতে হবে।

মানুষ যখন অন্যের সাথে আচরণে তাকে তার অবস্থানে না রাখে এবং অবস্থান অনুযায়ী তাকে মূল্যায়ন না করে, সেক্ষেত্রে জাহালাতপূর্ণ আচরণের অবতারণা ঘটে।

যেমন ধরি, অফিসের প্রধানের সাথে কোনো কর্মচারী যদি এমন আচরণ করে যা অফিসের নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে করা হয়, তাহলে এর দ্বারা প্রধানকে অবমূল্যায়ন করা হবে। এমন আচরণকে বেয়াদবিমূলক আচরণ বলে। এটা জাহালাতপূর্ণ আচরণ। মূর্খতাসুলভ আচরণ। আবার যদি কেউ নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে প্রধানের মতো আচরণ করে, তাহলে এটা হবে রক্ষীর সাথে বিদ্রূপ। এর দ্বারাও মানুষকে ছোট করা হয়। তাই এটাও জাহালাতপূর্ণ আচরণ।

অনেক সময় বন্ধুরা একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত মনঃকষ্টের কারণ না হয়, ততক্ষণ এগুলো জাহালাতপূর্ণ আচরণ হয় না। ঠাট্টা-বিদ্রূপ সমপর্যায়ের মানুষদের পরিবেশে সাধারণত দূষণীয় নয়। কিন্তু যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক হয় সম্মানের, সেখানে বিদ্রূপকে জাহালাতপূর্ণ আচরণ বলা হবে। এ কারণেই অফিসের একজন মাঝারি স্তরের কর্মচারী যদি পিয়নের সাথে এমন আচরণ করে যা প্রধানের সাথে করা হয়, তাহলে সেটাকে বিদ্রূপ বলা হবে। মূর্খতাসুলভ আচরণ বলা হবে। নিচের আয়াতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কথাটি লক্ষ করুন-

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ — سورة البقرة: 67

“এবং (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করেছেন।”

তারা বলল, 'আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন?' তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।" – সূরা বাকারা, ০২:৬৭

একজন পয়গম্বর আল্লাহর বিধান নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে না। তাই তিনি বলছেন, এমন জাহালাতপূর্ণ আচরণ থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।

মানুষের জান, মালের উপর যেকোনো আঘাতকে জুলুম বলে। আর মানুষের ইজ্জতের উপর কেউ যদি এমনভাবে আঘাত করে যা স্থায়ী হয়, দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে এটাও জুলুম। তাই গীবত, চোগলখোরীর দ্বারাও মানুষের উপর জুলুম হয়।

পক্ষান্তরে মানুষের ইজ্জত-সম্মানে কেউ যদি এমন আঘাত করে যা স্থায়ী নয়, বরং সাময়িকভাবে তাকে হেয়-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, তাহলে এমন আচরণকেই মূলত জাহালাতপূর্ণ আচরণ বলে। যেমন ধরি, একজন বাসের হেল্পার একজন আলেমকে বাসে উঠাতে চাচ্ছে, কিন্তু তিনি এই বাসে যাবেন না, তাই উঠতে চাচ্ছেন না। এর প্রেক্ষিতে হেল্পার ওই আলেমকে মোল্লা বলে তাচ্ছিল্য করলো, কিংবা ক্ষেত বলল... ইত্যাদি।

আবার কোনো একটি জিনিস কেনার জন্য আমরা কোনো দোকানে ঘুরে দেখলাম, কিন্তু পছন্দ হয়নি। ফেরত আসার পথে দোকানদার কোনো বিদ্রুপমূলক আচরণ করলো। এগুলো জাহালাতপূর্ণ আচরণ। অনেক সময় বাসের হেল্পারের সাথে ভাড়া নেয়ার সময় যাত্রীরা জাহালাতপূর্ণ আচরণ করে। আবার এর উল্টোটাও অনেক সময় হয়।

এগুলো সব জাহালাতপূর্ণ আচরণ। এসব আচরণ কেউ করলে ইসলামের শিক্ষা হলো এড়িয়ে চলা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ – سورة الأعراف:199

"আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" [সূরা আরাফ, ০৭:১৯৯]

সুনানে আবু দাউদে এসেছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» – (سنن أبي داود ، رقم الحديث: 5094)

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘর থেকে যখনই বের হয়েছেন তখনই আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া পড়েছেন, (اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ) "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি (ঘরের বাইরে গিয়ে) নিজে নিজে বা কারো দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে অথবা নিজে নিজে বা কারো দ্বারা পদস্খলিত হওয়া থেকে। কিংবা কারও প্রতি জুলুম করা বা কারও দ্বারা জুলুমের স্বীকার হওয়া থেকে। অথবা কারো সাথে জাহালাতপূর্ণ আচরণ করা থেকে কিংবা কারো জাহালাতপূর্ণ আচরণের স্বীকার হওয়া থেকে।" [সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৪]

দোয়াটি আমাদের প্রত্যেকের মুখস্থ করা এবং আমলে আনা উচিত। এ দোয়া পড়ার মাধ্যমে ঘর থেকে বের হওয়ার পর যত ধরনের

গুনাহের পথ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পথ আছে সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

কেউ যখন মূর্খতাসুলভ আচরণ করে, এর সর্বোত্তম জবাব হলো, তাকে এড়িয়ে যাওয়া। ওই ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে আমাদের সম্মান নষ্ট করতে চাচ্ছে। এখন যদি তার কথার প্রতিউত্তর দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের সম্মান আরও নষ্ট হতে থাকবে। তার কথার উত্তর দিয়ে আমরা আমাদের সম্মান উদ্ধার করে আনতে পারব না। এরচেয়ে বরং যখন তাকে উপেক্ষা করব, তখন আশপাশে যারা আছে তারা বুঝে নিবে যে, আমরা ভদ্র ও সম্মানিত; তাই তার এমন আচরণের প্রতিউত্তর আমরা দেইনি। মূলত জাহেলদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া মানে নিজেদের সম্মানকে আরও নষ্ট করা।

তাছাড়া যখন আমরা তার কথার উত্তর দিতে যাব, তখন ঐ জাহেল তার জাহালাত আরও বাড়িয়ে দিবে। আর এমন ব্যক্তির পরবর্তীতেও অনুশোচিত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যখন আমরা তাকে এড়িয়ে চলে আসব, তখন কোনো এক সময় হয়তো ওই জাহেল ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। হয়তো আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণে তার জন্য এমন আচরণ থেকে ফিরে আসার পথ তৈরি হবে।

হিলম ও হুলম

আরবীতে একটি শব্দ আছে হিলম অর্থাৎ সহ্য ক্ষমতা। আরেকটি শব্দ ‘হুলম’ যার অর্থ আকল। মানুষের যখন ‘হুলম’ (আকল তথা বিবেক) পূর্ণতা পায় তখনই তার মধ্যে ‘হিলম’ তৈরি হয়।

মনে রাখব, যার বিবেক যত পরিপূর্ণ, তার হিলম (ধৈর্য ক্ষমতা) তত বেশি। সুতরাং এমন ব্যক্তিরা মানুষের জাহালাতপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হয় না। হিলমের অধিকারী ব্যক্তি ঝগড়া করার আগে তার বিবেক তার সাথে ঝগড়া করে। ফলে তারা অন্যের সাথে ঝগড়া করার সুযোগ পায় না।

জাহালাতপূর্ণ আচরণের জন্ম হয় অনিয়ন্ত্রিত গোস্বার কারণে। যার গোস্বার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, সে ছোট ছোট বিষয়ে মানুষের উপর গোস্বা করে। আর তখনই মূর্খতাসুলভ আচরণ তার থেকে প্রকাশ পায়। এ ধরনের গোস্বার মোকাবেলা কখনোই আমরা গোস্বা দিয়ে করতে পারব না। কারণ যার গোস্বার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, সে অন্যদের গোস্বা দেখলে আরও গোস্বান্বিত হয়। তার গোস্বার আগুন আরও কঠিনভাবে জ্বলে উঠে।

তাই এমন ব্যক্তিদের মূর্খতাসুলভ আচরণ দেখার পর আমাদের গোস্বাকে সংবরণ করা এবং তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত বিবেকবানদের কাজ।

কেউ যখন গোস্বার সময় কষ্ট করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, তখন এটাই তার মধ্যে ধীরে ধীরে হিলমের গুণ তৈরি করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তম আখলাক দান করুন। মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে হেফাযত করুন এবং কেউ কষ্ট দিলে হিলম দ্বারা তা মোকাবেলা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিক্ষিপ্ত দুটি কথা

০১. কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। সুতরাং যে তাকওয়ার যে স্তরে আছে তার জন্য কুরআন সে পর্যায়ের হেদায়াত। কিন্তু যখন কেউ তাকওয়ার একদম প্রথম ধাপ (ঈমান) থেকেও বের হয়ে যায়, তখন তার জন্য কুরআন হেদায়াত থাকে না।

কুরআনের দুটি দিক আছে। এ কুরআন দ্বারা কেউ হেদায়াত পায়। আবার কেউ গোমরাহ হয়। সুতরাং কেউ যখন ঈমানের কাতার থেকে বের হয়ে যায়, আর অন্তরের মধ্যে কুরআনের প্রতি সন্দেহ-সংশয় এবং হেদায়াত গ্রহণে অনীহা থাকে, তখন এমন ব্যক্তিকে কুরআন আরও গোমরাহ করে দেয়। يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.

ফিসক যখন অনেক বেড়ে যায়, তখনই মানুষের অন্তরে হকের ব্যাপারে শক-শুবাহ বাড়তে থাকে। আর তখনই এসব লোক নাস্তিক হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

০২. মুত্তাকীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সিফাত হলো, তাদের যতটুকু আছে ততটুকু থেকেই কষ্ট করে হলেও তারা দান করে থাকে।

কুরআনে তাকওয়ার উপর সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়াত তিনটি। তিনটি আয়াতেই দান করার বিষয়টি বিশেষভাবে এসেছে-

প্রথম জায়গায়- ومما رزقناهم ينفقون ("যারা আমার দেওয়া রিযিক থেকে (চাই কম থাকুক বা বেশি) খরচ করে।")

২য় জায়গায়- وآتى المال على حبه ("যারা সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সম্পদ দান করে।")

৩য় জায়গায়- الذين ينفقون في السراء والضراء ("যারা সচ্ছল অবস্থায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে।")

এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, কষ্ট করে দান করাটা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহ তাআলা রমযানে আমাদেরকে খুব তাওফীক দান করুন।

শেষের দুটি কথা ছিল বিক্ষিপ্ত। যেহেতু রমযানের প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কযুক্ত না, তাই এগুলোকে আলাদাভাবে উল্লেখ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজে ইখলাস দান করুন, এবং কাজগুলো কবুল করুন। তাঁর দ্বীনের জন্য আমাদেরকে ফেদা হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সর্বশেষ তিনটি ছন্দ দিয়ে শেষ করছি।

خَلِّ الذنوبَ صغيرَها ... وكبيرَها ذاكَ التّقَى

واصنع كماشٍ فوقَ أرضِ ... الشوكِ يحذَرُ ما يرَى

لا تَحْقِرَنَّ صغيرةً ... إنّ الجبالَ مِنَ الحَصَى

ছোট-বড় সকল গুনাহ পরিত্যাগ কর, এটাই হচ্ছে তাকওয়া,

কাঁটাদার জমিনে পথিক যেমন সতর্কতার সাথে কাঁটা দেখে দেখে হাঁটে, তুমিও ওভাবে দ্বীনের পথে খুব সতর্কতার সাথে হাঁটো,

কোনো ছোট গুনাহকে ছোট মনে করো না, নিশ্চয় পাহাড়গুলো ছোট ছোট কংকরের সমষ্টি।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

*****